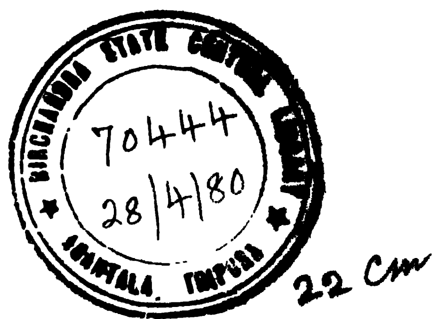
ত্রিপুরা ঃ সেকাল–একাল

শ্রীবিভাস কিলিকদার
বি. এ (অনার্স). বি, এড. এম, এ. এল এল, বি.



ওরিয়েন্ট বুক সোসাইটি
২৮ আখাউড়া রোড,
আগরতলা, ত্রিপুরা।

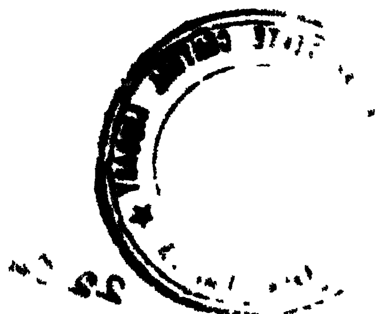
TRIPURA : SEKAL—EKAL

By

BIBHAS KILIKDAR

Price—5·00

প্রথম মুদ্রণ— জানুয়ারী, ১৯৮০ ইং



প্রকাশক— শ্রীবিনোদ বিহারী কিলিকদার।

মুদ্রণে— শ্রীপ্রেস, কৈলাসহর, উত্তর ত্রিপুরা।

প্রচ্ছদ শিল্পী— শ্রীপ্রশান্ত সেনগুপ্ত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণে - সুমুদ্রণ, আখাউড়া রোড, আগরতলা।

শ্রদ্ধেয়া জননী

শ্রীযুক্তা সুনীতি কিলিকদার

করকমলেষু

শ্রীমান বিভাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। বর্তমানে অতীত ত্রিপুরার জনজীবনের সংগ্রামী ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে রত। গবেষণাকার্য নির্ধারিত পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। মূল থিসিস্ ইংরেজীতে প্রকাশিত হবে। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের মুখ চেয়ে সেই অনুসন্ধানের কিছু কিছু খবর বাংলায় লিখে দিয়েছে। তৎসহ ক'টি রচনায় রয়েছে সাম্প্রতিক ত্রিপুরার কয়েকটি সমস্যার উপর আলোকপাত।

ত্রিপুরার জনজীবনের ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের প্রয়োজন-সাধক হবে মনে করে সেই রচনাগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশ করা গেল।

—প্রকাশক

: মুখবন্ধ :

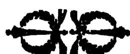
ত্রিপুরার গৌরবময় ইতিহাস যা এখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত, তা পুনরুদ্ধারে অনুসন্ধিৎসু গবেষকগণ বহুদিন ধরেই নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন। এই প্রাচীন রাজ্যের সভ্যতা সংস্কৃতি ঐতিহ্যবাহী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ত্রিপুরার অতীত ঐতিহ্যের সঠিক মূল্যায়ন, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ইতিহাসের এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।

ত্রিপুরায় সংঘটিত বিভিন্ন বিদ্রোহের উপর গবেষণা করতে গিয়ে অনেক নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। এই গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছি। ভবিষ্যৎ গবেসকরা নিজেদের কর্মসাধনার পথে যদি একটু সাহায্য পান, – এই ভেবে কয়েকটি নির্বাচিত প্রবন্ধ গ্রথিত করে "ত্রিপুরা : সেকাল—একাল" নামে একটি সংকলন পুস্তক রচনায় উদ্যোগী হয়েছি। প্রবন্ধগুলি সর্বৈব মৌলিক নয়। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, প্রবন্ধ এবং পুস্তক থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছি। আশাকরি আগ্রহী পাঠকবর্গ, যাঁরা ত্রিপুরাকে জানতে চান, তাঁরা হয়ত এই সংকলন পুস্তক হতে কিছুটা সহায়তা পাবেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু খুব সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত হয়েছে, যার ফলে প্রবন্ধগুলিতে সম্যকভাবে আলোচনা করা সম্ভব হয় নি। কেবলমাত্র "ত্রিপুরায় সমশের গাজী ও তাঁর বিদ্রোহ" প্রবন্ধটি তুলনামূলক একটু বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর বিস্তৃত আলোচনা পাঠকগণের সামনে তুলে ধরার আশা রাখি।

এই সংকলন পুস্তক রচনায় বহুজনের কাছ থেকে বহু মূল্যবান সাহায্য লাভ করেছি। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীরমাপ্রসাদ দত্ত (পল্টুদা) তাঁর রমাপ্রসাদ

গবেষণাগার, আগরতলা থেকে বহু মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন। আমার গবেষণাকার্যে তাঁর অকৃপণ সহায়তা আমাকে নিঃসন্দেহে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। শ্রীপরিমল ভৌমিক বহু পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং পুস্তকখানিকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ডঃ সুখেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। শ্রীপ্রশান্ত সেনগুপ্ত অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও কষ্ট স্বীকার করে প্রচ্ছদ তৈরী করে দিয়েছেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার কাজে শ্রীমতী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করেছি। এছাড়া আরও অনেকের কাছ থেকে নানা ভাবে সাহায্য সহায়তা পেয়েছি, তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

—বিভাস কিলিকদার।



॥ সূচীপত্র ॥

: ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে :

কামরূপ ও রাক্ষিয়াং দেশের মধ্যবর্তী স্থানকে প্রাচীন আর্যগণ সুক্ষ্ম আখ্যা দান করেন। এর অন্য নাম কিরাত দেশ। বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে, 'ভারতের পুর্বদিকে কিরাতের বাস।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে লৌহিত্য-বংশীয় মানুষদের আর্গ-ঋষিগণ কিরাত আখ্যায় অভিহিত করেছেন। তদনন্তর কিরাত ভূমি "তৃপুরা" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই তৃপুরা থেকে ক্রমে "ত্রীপুরা" এবং ত্রীপুরা থেকে "ত্রিপুরা" শব্দের উৎপত্তি।

তৃপুরা শব্দের মূল নির্ণয় করা সুকঠিন। তন্ত্র ও পুরাণ আলোচনা দ্বারা বিবিধ প্রকার সিদ্ধান্ত অনুমান করা যেতে পারে। ত্রিপুরাসুর থেকে 'ত্রিপুরা' নামের উৎপত্তি, কিম্বা ত্রিপুরাসুর নির্মিত তিনটি পুরী হতে 'ত্রিপুরা' নামের উদ্ভব, অথবা ভগবতী ত্রিপুরাসুন্দরী হতে 'ত্রিপুরা' নামের উৎপত্তি, কিম্বা রাজ বংশের স্থাপন কর্তার নামানুসারে এই দেশ 'ত্রিপুরা' আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছে।

ব্রহ্মার প্রাচীন ইতিহাস 'মহারাজোয়াং' গ্রন্থে ত্রিপুরা রাজ্য 'পাটিকাড়া' নামে পরিচিত হয়েছে। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস 'রাজোয়াং' গ্রন্থে ত্রিপুরাকে 'খুরত্তন' বলা হয়েছে। মিতাই (মনিপুরী) গণ ত্রিপুরাকে 'তকলেঙ্' রাজ্য বলত। মিনহাজ, জয়য়েবারনি প্রভৃতি প্রাচীন মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ ত্রিপুরাকে 'জাজনগর' বা 'জাজিনগর' বলে বর্ণনা করেছেন। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ইতিহাসে ত্রিপুরা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে।

রাজমালায় উল্লেখ আছে মহারাজ ত্রিপুর এই রাজ্যের ত্রিপুরা নামের প্রবর্তক। তাঁর সময় থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে। বিশ্বকোষ ৮ম ভাগ, ২০০ পৃষ্ঠায় ত্রিপুর সম্পর্কে উল্লেখ আছে, "দ্রুহ্যু হইতে দ্বাবিংশ নৃপতির পর ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহন করেন।" এই প্রবাদে বিশ্বাস করিলে দেখা

---

২১ শে অক্টোবর, ১৯৭৮ ইং, ৩রা কার্তিক. ১৩৮৫ বাং দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত।

যায় যে, যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যুর অধঃস্তন ৩৩শ পুরুষে যুধিষ্ঠির বর্তমান। পৌরাণিক বিবরণে ৪/৫ পুরুষের অন্তর (১৫০/১৭৫ বৎসরের পার্থক্য হইলেও) ধর্তব্য নহে। এতএব রাজমালার মতে ত্রিলোচনকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক স্বীকার করা অপেক্ষা মহাভারতের মতে ত্রিপুরকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক স্বীকার করাই সঙ্গত। আবার অন্যত্র উল্লেখ আছে, "মহাভারতের বনপর্বে যখন ত্রিপুরার নাম পাওয়া যায়, তখন অনুমান করিতে হইবে যে, ত্রিলোচনের পিতা ত্রিপুর যুধিষ্ঠিরের পূর্ববর্তী না হউন তাঁহার সমসাময়িক বটে। সভাপর্বে ভীমের দিগ্বিজয়ে যখন ত্রিপুরা নাম নাই, কিরাত নামই আছে, তখন ইহাও বুঝিতে হইবে যে, রাজসূয় যজ্ঞকালে ত্রিপুর বর্তমান থকিলেও তখনও রাজ্যের নাম পরিবর্তন করেন নাই। ইহাও সম্ভব। কারণ, রাজসূয় যজ্ঞের পর দুর্যোধন দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণকে দ্বাদশ বৎসর বনে প্রেরণ করেন। এই বনবাসের শেষ অবস্থায় ঘোষ যাত্রা ঘটে। তৎপরে কর্ণ কর্তৃক ত্রিপুরা বিজিত হয়; সুতরাং ভীম কর্তৃক কিরাত রাজ্য জয়ের দ্বাদশ বৎসর পরে কর্ণ কর্তৃক ত্রিপুরা বিজিত হয়; সুতরাং ভীম কর্তৃক কিরাত রাজ্য জয়ের দ্বাদশ বৎসর পরে কর্ণ কর্তৃক ত্রিপুরা নামে কিরাত" রাজ্য জয় করা কিছু অসম্ভব নহে। এই ঘটনা হইতে অনায়াসে ত্রিপুরকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে।

সুতরাং উক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে মহারাজ ত্রিপুর নিজ প্রতিপত্তি বিস্তার এবং নিজেকে অমর করে রাখতে কিরাত ভূমিকে 'ত্রিপুরা' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। অবশ্য এস্থলে বলা উচিৎ ঐ সকল ঘটনা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক বলে গ্রহণ করা যায় না; ঐগুলিকে পৌরাণিক আখ্যায়িকা স্বরূপ গণ্য করা যেতে পারে।

দ্রুহ্যু পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে সুন্দরবনে যে রাজ্য

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার নাম ছিল 'ত্রিবেগ।' সুন্দরবনস্থিত ত্রিবেগে দ্রুহ্যু বংশীয়গণের আধিপত্য থাকাকালেই ত্রিপুরার সাথে তাঁদের সংস্রব ঘটেছিল। ত্রিবেগপতি প্রতর্দ্দন কিরাত দেশ জয় করে ত্রিপুরার আধিপত্য লাভ করেন। তদবধি মহারাজ মিত্রারি পর্যন্ত পাঁচজন রাজা সুন্দরবন ও ত্রিপুরা উভয় প্রদেশ শাসন করেছেন। সেই সময় তাঁরা কখনও সুন্দরবনে এবং কখনও ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী রাজপাটে অবস্থান করতেন। কিরাত বিজয়ী প্রতর্দ্দনের পৌত্র কলিঙ্গ কর্তৃক সুন্দরবনে প্রতিষ্ঠিত "ত্রিপুরা সুন্দরী" র বিগ্রহ এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ত্রিবেগপতি প্রতর্দ্দন যখন কিরাত দেশ জয় করেন, তখন কিরাতরা কিরাত ভূমিতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত। প্রথমাবস্থায় সবগুলি দলই ত্রিবেগপতির কাছে বশ্যতা স্বীকার করেনি। যারা বশ্যতা স্বীকার করল, তারা পরবর্তীকালে নবাগতদের কাছে 'হালাম' হিসাবে পরিচিত হল। এই হালাম নামের পাশ্চাতে দুটি মত প্রচলিত আছে। যারা রাজার বশ্যতা স্বীকার করে রাজাকে সালাম করল, তারাই পরবতীকালে 'সালাম'—সালাম হতে 'হালাম' নামে অভিহিত হল। 'সালাম' হতে 'হালাম' শব্দে রূপান্তরিত হওয়ার ব্যপারে পার্শ্ববর্তী আসাম রাজ্যের প্রভাব লক্ষণীয়। আবার 'হা' অর্থ মাটি, 'লাম' অর্থ পথ; মাটির পথ যাদের জীবনের অবলম্বন, তারাই হালাম। তৎকালিন কিরাতরা এক-মাত্র জুমচাষ দ্বারাই তাদের জীবিকা নির্বাহ করত,—মাটির পথই ছিল তাদের জীবনের অবলম্বন। তাই নবাগতদের কাছে এই-সব কিরাতরা হালাম হিসাবে পরিচিত হল। পক্ষান্তরে কিরাতদের কাছে নবাগতরা 'তুই-প্রা' নামে পরিচিত ছিল। 'তুই' অর্থ জল. 'প্রা' অর্থ সঙ্গমস্থল। রাজমালায় উল্লেখ আছে দ্রুহ্যু পিতা কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের সন্নিহিত প্রতিষ্ঠান নগর হতে সুন্দরবনের নিম্নভাগস্থ সগরদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন

করেছিলেন । সগরদ্বীপস্থিত দণ্ডিগণের সাথে ঘনিষ্ঠতা, সুন্দরবনে ত্রিপুরেশ্বরের স্থাপিত ত্রিপুরা সুন্দরী বিগ্রহ এবং সগরদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির ইত্যাদি দ্বারা এ-বিষয় বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যাইহোক জলের সঙ্গমস্থল সগরদ্বীপ থেকে আগতরা কিরাতদের কাছে 'তুই-প্রা' নামে পরিচিত ছিল এবং এই তুই-প্রা' ধীরে ধীরে 'টিপরা' তে রূপান্তরিত হল। কালক্রমে এই 'টিপরা' শব্দ থেকে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি হতে পারে।

শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "সমুদ্রকূলে প্যাকাকুলি (Pacaculi) কুইপিটাভাজ (Cuipitavaz) নলদী (Naldy) ডাপারা (Dapara) এবং টিপারিয়া (Tiparia) নামক পাঁচটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল ; তাহা এক্ষণে নাই।" সতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় অন্যত্র বলেছেন, "টিপারিয়া সহর ত্রিপুরার বিকৃত নাম বলিয়া বোধ হয়।"

'ত্রিপুরা' নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এ যাবৎ কোন মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন ভাবে 'ত্রিপুরা' নামের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশই কল্পনাপ্রসূত এবং ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নেই। মহারাজ ত্রিপুরর নাম অনুসারে রাজ্যের নাম ত্রিপুরা হয়েছে—এটা কিছুটা যুক্তিগ্রাহ্য ; কেননা রাজার নাম থেকে রাজ্যের নাম প্রকরণের নজির ইতিহাসে পাওয়া যায়। 'তুই-প্রা' শব্দ থেকেও ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি,—অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য ; কারণ 'তুই-প্রা' এবং 'ত্রিপুরা' শব্দ দুটির মধ্যে কিছুটা ধ্বনিগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পরিশেষে বলা যায় যে সমতল ত্রিপুরার যে অংশ মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয়েছিল তা 'রোশনাবাদ ত্রিপুরা' বা 'মোঘলান ত্রিপুরা' নামে আখ্যাত হত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে ত্রিপুরা নামে একটি পৃথক ব্রিটিশ জেলা গঠিত

হয়েছিল যা বর্তমানে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলা নামে পরিচিত। নৃপতি শাসিত ত্রিপুরা রাজ্য 'স্বাধীন ত্রিপুরা' 'কোহে ত্রিপুরা' 'পর্বত ত্রিপুরা' 'হিল টিপারা', 'রাজগী ত্রিপুরা' ইত্যাদি নামে অভিহিত—নামের বা অঞ্চলের স্বাতন্ত্র রক্ষার জন্য। পরবর্তী-কালে মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের রাজত্ব সময়ে এই রাজ্যের সরকারী নাম 'ত্রিপুরা রাজ্য' নামে গৃহীত হয়।



মধ্যযুগীয় ত্রিপুরার প্রশাসন ব্যবস্থা

প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা অন্যতম। দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরায় সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। উজীর, নাজির, সুবা, নেমজুর, কারকোন, কোতোয়াল, মুছিব, বড়ুয়া, হাজারী প্রভৃতি আমলাদের নিয়ে যে প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তার শীর্ষবিন্দু ছিলেন মহারাজ স্বয়ং। প্রত্যেক রাজকর্মচারীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছিল সুনির্দিষ্ট। কিন্তু রাজখান্দান, আইন প্রবর্তন, তালুক প্রদান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মহারাজ নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তাছাড়া সামন্ত-তান্ত্রিক প্রশাসনের অঙ্গ হিসেবে রাজ্যে সুস্থ নৈতিক পরিবেশ রক্ষা ও সামাজিক অনাচার বন্ধ করা রাজার কর্তব্য বলেই গণ্য হত।

প্রশাসনে উজীরের খুব প্রতিপত্তি ছিল। উচ্চশ্রেণীর কর্মকর্তারাও উজীরের অধীন ছিলেন। এমন কি এক সময়

---

২২ শে আগষ্ট, ১৯৭৮ ইং, ৫ই ভাদ্র. ১৩৮৫ বাং দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত।

রাজ্যের শাসন ও আইন প্রচলন প্রভৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর দায়িত্ব ও উজীরকে দেওয়া হয়েছিল। উজীর ও সুবা ছিলেন যথাক্রমে প্রশাসন ও সৈন্যবাহিনীর প্রধান। পরবর্তীকালে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ না থাকায় সুবা প্রশাসনের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে পড়েন এবং তার ফলে উজীর ও সুবার পদমর্যাদা নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। অবশেষে মহারাজের নির্দেশে উভয় পদকে সমান মর্যাদার অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়।

তৎকালে ত্রিপুরায় সর্দার প্রথা খুব প্রাধান্য ছিল। মহারাজের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্দার মনোনয়ন করা হত। রিয়াং সম্প্রদায় মোট তেরোটি দফায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক দফার জন্য দুজন করে মোট ছাব্বিশ জন সর্দার ছিল। তাদের বলা হত 'হুদ্দাদার'।

প্রত্যেকটি অঞ্চলের লুসাই সম্প্রদায়ের জন্য মহারাজ একজন করে চীফ বা সর্দার নিযুক্ত করতেন। নিজ নিজ এলাকার লুসাইদের সামাজিক শাসনের দায়িত্ব থাকত চীফদের উপর। প্রত্যেক চীফকে রাজার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে হত এবং রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিতে হত।

দূরবর্তী অথবা নববিজিত অঞ্চলের শাসনভার যাদের হাতে ন্যস্ত ছিল, তাঁরা 'লস্কর' নামে পরিচিত ছিলেন। সেকালে লস্করের পদ বিশেষ সম্মানিত ছিল এবং তাঁরা আপন আপন বিভাগের সর্বময় শাসনকর্তা ছিলেন। এই পদ মুসলমান শাসনের অনুকরণে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এককালে খণ্ডল (নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত) ও ছাম্বুল নগর (কৈলাশহর) ত্রিপুরার রাজার নিয়োজিত লস্কর দ্বারা শাসিত হত।

উপজাতি প্রশাসনের সুন্দর বর্ণনা 'ত্রিপুরা বুরুঞ্জী' তে পাওয়া যায়। রাংরুং ছিল একটি কুকি অধ্যুষিত গ্রাম। গ্রামের

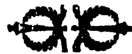
লোকসংখ্যা তিনশ। গ্রামের মহারাজার একজন প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি গ্রামের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি এবং তিনি 'হালামচা' নামেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর অধীনে আবার একজন গাভিম' একজন 'গাবুর', একজন 'চাপিয়া' এবং একজন 'দলই' ছিলেন। এঁদের সাধারণতঃ রাংরুং গ্রামবাসীদের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করা হত। এঁদের মধ্যে 'হালামচা'র উপর গ্রামের রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি গ্রামের রাজস্ব আদায় করে মহারাজের নিকট পাঠিয়ে দিতেন।

তৎকালে বিচার ব্যবস্থার শাসনকর্তাগণ ন্যায় ও ধর্মানুমোদিত যুক্তি অবলম্বনে নিজের বিবেকানুয়ায়ী বিচার কার্য্য সম্পাদন করতেন। সেকালে আইন ব্যবসায়ীর কুটবুদ্ধি ধর্মাধিকরণে প্রবেশ লাভের সুযোগ পেত না। দোষী ব্যক্তি সরল চিত্তে বিচারকের কাছে আত্মদোষ স্বীকার করত। মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত করে নির্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করার সুযোগ কমই ছিল। বিচারপ্রার্থীগণ বিচারককে পিতা, অভিভাবক অথবা দেবতার মত মনে করত এবং কোন পক্ষই তাঁর কাছে মনোগত ভাব ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হত না। সুতরাং সেকালের বিচারে বর্তমান কালের ন্যায় আইন নজিরের মারপেঁচ অথবা সওয়াল জবাবের 'সোরহাঙ্গামা' ছিল না। এজন্য বিচারের পথ অতিশয় সরল ছিল এবং সহজেই সত্যোদ্‌ঘাটিত হত।

গুরুতর অপরাধের জন্য শিরশ্ছেদ অথবা শূলে চড়িয়ে প্রাণদণ্ড দেবার ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন সময় অপরাধী ব্যক্তিকে কুকুর দ্বারা খাওয়ানো হত। তাছাড়া হাতীর পায়ের নীচে নিক্ষেপ এবং নাক, কান ইত্যাদি কেটে নেওয়ার ও ব্যবস্থা ছিল। এ সকল দণ্ডাদেশ কোন প্রকাশ্য স্থানে সাধারণের সামনে কার্যে পরিণত করবার বিধান ছিল।

মধ্যযুগীয় ত্রিপুরার যে প্রশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল,

তাকে স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। Hunter এর 'Statistical Account of Bengal' এ উল্লেখ আছে, "The court dispensed justice according to a primitive system of equity and good conscience and there was no regular judicial procedure" মহারাজ ইচ্ছা করলেই আদালতের যে কোন রায়কে বাতিল করে দিতে পারতেন। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারে মহারাজ বিভিন্ন উপজাতিদের সর্দারদের দ্বারা শাসন কার্য চালাতেন। এই সর্দাররা মহারাজ এবং উপজাতিদের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতেন। প্রয়োজনে মহারাজ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সর্দারদের মাধ্যমে প্রজাদের কাছে তাঁর আবেদন রাখতেন। সাধারণ প্রজাদের তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সর্দারদের সমস্ত প্রকার সামাজিক অর্থ-নৈতিক এবং রাজনৈতিক অনুশাসন মেনে চলতে হত। সর্দারদের সিদ্ধান্তের ন্যূনতম অবহেলাতেও কঠোর দণ্ডবিধান করা হত। এইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দার এক-নায়কদের সহায়তায় তৎকালে রাজকীয় এক-নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল।



অষ্টাদশ শতাব্দীর ত্রিপুরার অর্থ-নৈতিক রূপরেখা

অষ্টাদশ শতাব্দীর ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অরণ্য প্রদেশ নিতান্তই জনবিরল ছিল এবং কতিপয় সংকীর্ণ নদী উপত্যকা অঞ্চলের সামান্য অংশেই কিছু জনবসতি দেখা যেত, যারা হলকর্ষণে অভ্যস্ত ছিল। পার্বত্য ত্রিপুরা প্রধানতঃ ত্রিপুরী অধ্যুষিত ছিল। এই ত্রিপুরীরা আবার বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এই সম্প্রদায়গুলি যথাক্রমে—১। ত্রিপুরা, ২। নোয়াতিয়া, ৩। হালাম, ৪। জমাতিয়া, ৫। রিয়াং, ৬। ওছই, ৭। মগ, ৮। চাকমা, ৯। গারো, ১০। লুসাইকুকী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক। ত্রিপুরা-বাসী এই সকল সম্প্রদায়ই ত্রিপুরী বলে পরিচিত ছিল। এই সকল সম্প্রদায়ই একই বংশোদ্ভূত নয়। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন করণে এরা ত্রিপুরায় বসতি বিস্তার করে। এদের ভাষা, আচার আচরণ এবং সংস্কৃতিতে বেশ কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এদের অধিকাংশই জুম কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। সমতল ত্রিপুরা প্রধানতঃ বাঙ্গালী-হিন্দু মুসলমান অধ্যুষিত ছিল। বিগত তিনশ বৎসরের কাগজ পত্র থেকে যতটুকু জানা যায় পার্বত্য ও সমতল-বাসী প্রজাগণের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ও শান্তি মোটামুটি অক্ষুন্ন ছিল।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় ক্রীতদাস প্রথা অনেক দিন ধরেই চালু ছিল। ক্রীতদাস ছাড়াও এই রাজ্যে "জোলাই" নামে আরেক শ্রেণীর প্রজা ছিল, যাদের প্রথানুসারে রাজ-পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির অধীনে

৩রা আগস্ট, ১৯৭৮ ইং, ১৭ই শ্রাবণ ১৩৮৫ বাং দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত।

ক্রীতদাসের মত আজীবন কাজ করতে হত। ১৮৭৭ সালে (১২৮৮ ত্রিং, ১৭ই আষাঢ়) খাস আপীল আদালতের বিচার-পতি এক ঘোষণায় রাজ্যে দাসদাসী কেনা-বেচা বা বন্ধক রাখা নিষিদ্ধ করেন। "ঝোলাই" প্রথানুসারে যে সব প্রজা কাজ করত, তাদের ঐ ব্যক্তিগত সেবার বিনিময়ে ঘর চুক্তি খাজনা হ্রাস করে ঐ পরিমাণ খাজনা ঝোলাই প্রজার মালিককে দেয়ার রেওয়াজ ছিল। এই প্রথার সম্প্রসারণের ফলে রাজস্বের পরিমাণ কমে যায়।

ভারতের মুসলমান রাজত্বকালে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য মুলক কর প্রবর্তনের ইতিহাস বহুবিদিত। জিজিয়া করের মত উগ্র সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের নামাবলিতে চিহ্নিত না হলেও, ভারতবর্ষের হিন্দু রাজ্যেও কেবলমাত্র মুসলমান প্রজাদের উপর আরোপিত বৈষম্যমুলক করের অস্তিত্ব ত্রিপুরার ইতিহাসে পাওয়া যায়। ত্রিপুরা রাজ্য সীমায় শাদি বা নিকে কার্য্য সম্পাদনের পূর্বে প্রত্যেক পাত্র অথবা অভিভাবককে সরকারী নজর বা কাজিয়ানা কর দাখিল করে সরকারী খাতায় রেজিস্ট্রি-ভূক্ত হয়ে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হত। এই নিয়ম লঙ্ঘন ছিল দণ্ডনীয়। রাজগী ত্রিপুরা সরকারের এক পর্যালোচনায় উল্লেখ পাওয়া যায়, কাজিয়ানা কর ইজরা প্রথায় আদায় করা হত। দরিদ্র মুসলমান প্রজাদের পক্ষে এই কর ছিল গুরুভার। এই হতে বার্ষিক আয়ের পরিমাণও ছিল নগণ্য। বার্ষিক তিনশ টাকা থেকে তিনশ পঞ্চাশ টাকার উর্দ্ধে আয় হত না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরায় "বীরসিংহ" নামক একটি সরকারী করের প্রচলন ছিল। কামিং এর রিপোর্ট অনুসারে [Survey and Settlement of the Chakla Rosnabad Estate, 1907—J. G. Cumming] বীরসিংহ নামক কোন ব্যক্তির নামের সঙ্গে সরকারের প্রদেয় এই করটির নামকরণ

হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে চাকলা রোশনাবাদের অন্তর্গত নুরনগর ইত্যাদি পরগণা সমূহ প্রাচীনকালে চাকলার সম্ভ্রান্ত জমিদার, তালুকদার, চৌধুরী শ্রেণীর ভূমধ্যকারী ভিন্ন, সময়ে সময়ে পশ্চিমদেশ হতে আগত ইজারাদারগণের সাথে ইজারা [Farm lease] বন্দোবস্তে রাজস্ব আদায় হত। লালা বীরসিংহ, রঘুনাথ তেওয়ারী ইত্যাদি ইজারাদারের নাম কামিং রিপোর্টে দেখা যায়। রাজমালা সম্পাদক কালী প্রসন্ন সেনের মতে যুদ্ধ বিগ্রহ কালে রাজ সরকার হতে প্রবর্ত্তিত বিশেষ করের নাম ছিল বীরসিংহ। এই যুক্তি অপেক্ষা কামিং-এর মতই গ্রহণীয় মনে হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেহারা চাকর পোষণার্থ নিষ্কর ইনাম দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্বকালের একটি ঘোষণায় তার নিদর্শন পাওয়া যায়। "ত্রিপুরা মেহেরকুল পরগণার অন্তর্গত তপে রাজাপাড়া ও তপে বানামুয়া মধ্যে হরিনারায়ণ চৌধুরী, রামবল্লভ চৌধুরী ও সীতারাম চৌধুরীকে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য প্রদত্ত ৮/০ আট দ্রোণ চারি কানি ভূমি নিষ্কর ইনাম সনন্দের খণ্ডিতাংশ [সন ১১৭১ ত্রিপুরাব্দ, ১৩ই বৈশাখ]:—

"মহাফিলক তপছিল ৮/০ জমি তোমারগ বেরা চাকর রাখনের জন্য ইনাম দেওয়া গেল। এই জমি দিয়া তোমারগ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে বেরা চাকর রাখিয়া তোমারগ আপন আপন কাজ কর্ম করাও। এই জমির মাল খাজনা ও বৃসিংহ ইত্যাদির সমস্তাঙ্ক নিষেধ।"

১৭৩২ খৃষ্টাব্দে জগৎ মাণিক্যের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার নবাব সুজাউদ্দিন ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র অধিকার করে চাকলা রোশনাবাদ আখ্যা প্রদান করেন এবং বার্ষিক ৯২,৯৯৩ টাকা কর ধার্য্য করে জগৎমাণিক্যকে জমিদারি স্বরূপ প্রদান করেন।

এই ৯২,৯৯৩ টাকা রাজস্বের মধ্যে পরগণে নূর নগরের বার্ষিক রাজস্ব ২৫,০০০ টাকা দিল্লীর সম্রাটের পূর্ব আদেশ মত সামরিক জায়গীর এবং হাতী ধরার খরচ বাবদ ২০,০০০ টাকা, মোট ৪৫,০০০ টাকা বাদ দিয়ে ৪৭,৯৯৩ টাকা আদায়ী রাজস্ব নির্ণিত হয়। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দ মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎকালে চাকলা রোশনাবাদের বার্ষিক রাজস্ব ৭৮,৩০৫ টাকার মধ্যে পূর্বোক্ত সামরিক জায়গীর ও হাতী ধরার খরচ মোট ৪৫,০০০ টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ৩৩,৩০৫ টাকার নিয়মিত বার্ষিক রাজস্ব প্রদান করতে হত।

আনুমানিক প্রায় ১৭৫০ খৃস্টাব্দ নাগাদ সমশের গাজি নামক এক কৃষক নেতা সমতল ত্রিপুরার শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন এবং প্রায় ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। সমশের গাজি রাজ্যের সকল দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে এমন কি, ক্রীতদাসদের মধ্যেও বিনামূল্যে জমি বন্টন করেছিলেন। তিনি রাজস্বের যে ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে দরিদ্র প্রজাগণকে কোন কর দিতে হত না। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের এক আশ্চর্য্য নিয়ম চালু করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে ৮২ সিক্কা ওজনের সের ধার্য্য হয়েছিল। তিনি সেই সেরের পরিমাণে কোন দ্রব্য কত মূল্যে বিক্রি হবে তার একটি তালিকা প্রত্যেক বাজারে টাঙ্গিয়ে দিয়েছিলেন। কেউ এর অন্যথা করতে পারত না। নিম্নে সেই তালিকার একটি নমুনা দেওয়া হল।

চাল— (১ সের —৫ = এক পয়সা),
লঙ্কা মরিচ— (১ সের —৫ = এক পয়সা),
গুড়— (১ সের—১০ = দুই পয়সা),
লবণ— (১ সের—১০ = দুই পয়সা),

রসুন পেঁয়াজ— ১ সের = ৫১০ দুই পয়সা
কার্পাস— ১ সের = পাঁচ পয়সা
কলাই— ১ সের = ৫১০ দুই পয়সা
মটর— ১ সের = ৫১০ দুই পয়সা
মুগ— ১ সের = চার পয়সা
অড়হর— ১ সের = চার পয়সা
তৈল— ১ সের = তিন আনা
ঘৃত— ১ সের = পাঁচ আনা

এই তালিকার দ্বারা পলাশীর যুদ্ধের সময়ের বাজার দরের একটা চিত্র পাওয়া যায়।

পরিশেষে ইংরেজ আগমনের ফলে ত্রিপুরায় সমতল অঞ্চলের জনজীবনে বিপর্যয় ঘটেছিল। কৃষির অবনতি ছাড়াও এখানকার প্রাচীন ও সমৃদ্ধ বস্ত্র শিল্পের সর্বনাশ সাধিত হয়েছিল। "১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ কাদবা ও চার পাতা নামক স্থানে দুইটি বাণিজ্যাগার সংস্থাপন করেন। ত্রিপুরার পর্বত জাত কার্পাস নির্মিত বাপ্তা বস্ত্রের বাণিজ্যই উল্লেখিত কুঠি স্থাপনের অভিপ্রায়। অন্যূন ১২ লক্ষ টাকার বাপ্তা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারা প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানি হইত। এই বাপ্তা বস্ত্রের দালালির দ্বারা লৌহ গড়ার সাহা পরিবার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গে ইহারা দ্বিতীয় জগৎশেঠ বলিয়া পরিচিত হন। বিলাতি শিল্পীগণ আমাদের বাপ্তা বাণিজ্যের শিরে কুঠারাঘাত করিয়াছেন।" (রাজমালা—কৈলাস সিংহ)

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মত ইংরেজরা ত্রিপুরায়ও নীল চাষের প্রবর্তন করেছিলেন। হান্টার-এর Statistical Account of Bengal পুস্তকে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'The opposition to the Industry on the part both of

the neighbouring Zaminder's and of the planters tenants was so desparate that nore of the factories could hold out against it." কৈলাশ সিংহের মতে নীল করের অত্যাচার কালে ত্রিপুরাবাসী যেরূপ একতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিল, বাংলার অন্য কোন জেলার লোক তা দেখাতে পারেনি। ত্রিপুরায় ইংরেজ শাসনের গোড়ার ইতিহাস আজও প্রায় অজ্ঞাত। নীল অত্যাচার ছাড়াও 'লবণ মহালের' উৎপীড়ন সেকালে সাধারণ মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। এই শোষণ ও অত্যাচারের বিস্তৃত ইতিহাস লেখা হলে অনেক রক্ত, স্বেদ ও অশ্রুর বিষাদক্লিষ্ট কাহিনী নিঃসন্দেহে উৎঘাটিত হবে।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম ত্রিপুরায় ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভের প্রথম বৎসরেই ভূমি রাজস্ব পূর্বাপেক্ষা ৬৬,৬৯৫ টাকা বৃদ্ধি পায়। পূর্বে আলিবর্দ্দি খাঁ ও সিরাজ-দৌল্লার শাসনকালে রোশনাবাদ চাকলার রাজস্ব ছিল ৩৩,৩০৫ টাকা। ইংরেজ শাসকগণ এই রাজস্ব বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ টাকা ধার্য্য করেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের বন্দোবস্তে এই রাজস্ব আরও বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ধার্য্য হয়। এই পর্বত প্রমাণ রাজস্বের বোঝা আর জমিদার ও তালুকদারগণের অবাধ শোষণের ফলে ত্রিপুরার হতভাগ্য চাষীরা অনিবার্য্য ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ান। এছাড়া জমিদার গোষ্ঠীর সর্দার ত্রিপুরার রাজার শোষণ ও উৎপীড়ন অবাধ গতিতে চলেছিল। এই ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে বহু কৃষক ঘর-বাড়ী ছেড়ে বনে জঙ্গলে পলায়ন করে। বহু কৃষক ধনী ব্যক্তিদের কাছে নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বিক্রী করে এবং নিজেরাও আত্মবিক্রয় করে হতভাগ্য দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

এই আলোচনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ত্রিপুরার জনজীবন অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তৎকালীন অর্থনীতি মুষ্টিমেয় সামন্ত প্রভুদের কুক্ষিগত ছিল। সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার উৎপীরণ আর ফরিয়া ব্যবসায়ীদের অবাধ শোষণের কবলে পড়ে বিশেষ করে কৃষক, শ্রমজীবিদের জীবন যাত্রা দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। তা না হলে সমশের গাজীকে শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম নির্দিষ্ট করে দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। পরিশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে—শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ত্রিপুরার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। এই সময়ের ত্রিপুরার ইতিহাস কলঙ্কের ইতিহাস। স্বল্প পরিসরে প্রায় জনা বিশেক রাজা রাজত্ব করেছেন। ঘরে বাইরে শত্রু, বিশ্বাসঘাতকতা, রাজনৈতিক কোন স্থিতিশীলতা ছিল না বললেই চলে। এই যখন রাজনৈতিক অবস্থা, তখন অর্থনীতি বিপর্যস্ত হতে বাধ্য।



ত্রিপুরায় সমশের গাজী ও তাঁর বিদ্রোহ

ত্রিপুরার ইতিহাসে সমশের গাজী একটি বিতর্কিত চরিত্র। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখক এই চরিত্রটিকে বিভিন্ন ভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃতরূপ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে কোন কোন লেখক তৎকালীন ত্রিপুরার মহারাজাকে, আবার কোন কোন লেখক সমশের গাজীকে মহান করে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন।

এই মোসাহেবীর কবলে পড়ে ঐতিহাসিক সত্য অনেকটা বিকৃতরূপ ধারণ করেছে। 'রাজমালা' 'শ্রীরাজমালা' 'কৃষ্ণমালা' প্রভৃতি গ্রন্থে সমশের গাজীকে তস্কর বা দস্যু হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার সমশের গাজীর জীবন চরিত লেখক শেখ মনোহর তাঁর 'গাজী নামা'য় সমশের গাজীকে এক মহান ব্যক্তি হিসাবে চিত্রিত করেছেন। সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' গ্রন্থে সমশের গাজী এক মহান কৃষক নেতা হিসাবে চিত্রিত হয়েছেন এবং তাঁর সংঘটিত বিদ্রোহ কৃষক বিদ্রোহ হিসাবে রূপ লাভ করেছে। যাইহোক, সমশের গাজী প্রকৃত পক্ষে কী ছিলেন, এ সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ত্রিপুরার ইতিহাসে সমশের গাজী এবং তাঁর বিদ্রোহ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সমশের গাজীর বিদ্রোহকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে তৎকালীন ত্রিপুরার সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক, অবস্থার উপর একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন। বিদ্রোহের পূর্ববর্তী ত্রিপুরায় নানাবিধ সামাজিক কু-প্রথা যথা 'জোলাই' 'তিতুন' ইত্যাদি প্রথা প্রচলিত ছিল, যাবফলে প্রজাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। তাছাড়া অর্থ-নৈতিক দিক দিয়েও জনসাধারণের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কেবল মাত্র মুসলীম সম্প্রদায়ের লোকদের 'কাজিয়ানা' নামে এক প্রকার সাম্প্রদায়িক কর বহন করতে হত, যা ছিল দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে গুরুভার। তৎকালীন অর্থনীতি মুষ্টিমেয় সামন্ত প্রভুদের কুক্ষিগত ছিল। সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার উৎপীড়ন আর ফরিয়া ব্যবসায়ী এবং কালোবাজারীদের শোষণের কবলে পড়ে বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, মজুর মেহনতি মানুষের জীবনযাত্রা দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল।

বিদ্রোহের পূর্ববর্তী ত্রিপুরার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে তখন

দুর্যোগের ঘনঘটা। এই সময়ের ত্রিপুরার ইতিহাস কলঙ্কের ইতিহাস। স্বল্প পরিসরে প্রায় জনাবিশেক রাজা রাজত্ব করেছেন। ঘরে বাইরে শত্রু, বিশ্বাসঘাতকতা। রাজনৈতিক কোন স্থিতিশীলতা ছিল না বললেই চলে। এই যখন রাজনৈতিক অবস্থা তখন অর্থনীতিও বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। উপরন্তু ইংরেজ আগমনের ফলে ত্রিপুরার সমতল অঞ্চলের জনজীবনে বিপর্যয় ঘটেছিল। কৃষির অবনতি ছাড়াও এখানকার প্রাচীন ও সমৃদ্ধ বস্ত্রশিল্পের সর্বনাশ সাধিত হয়েছিল। তাছাড়া নীলকরের অত্যাচার থেকে ত্রিপুরাবাসীও রেহাই পায়নি। তবে কৈলাশ সিংহের মতে, নীলকরের অত্যাচারকালে ত্রিপুরাবাসিগণ যেরূপ একতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিল, বাংলার অন্য কোন জেলার লোক তা দেখাতে পারেনি। ত্রিপুরায় ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই রাজস্ব বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ধার্য্য করা হয়। দেশব্যাপী অরাজকতার সময় একদিকে এই পর্বত প্রমাণ রাজস্বের বোঝা এবং তার সাথে জমিদার তালুকদারগণের অবাধ উৎপীড়নের ফলে ত্রিপুরার হতভাগ্য চাষীরা অনিবার্য ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ায়। এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়ে বহু কৃষক ঘর-বাড়ী ছেড়ে বনে-জঙ্গলে পলায়ন করে। বহু কৃষক নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বিক্রী করে এবং নিজেদের আত্মবিক্রয় করে হতভাগ্য দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

সামাজিক অর্থ-নৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে ত্রিপুরার এই যখন অবস্থা, তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই ত্রিপুরার জনগণ একটা পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে পড়েছিল। ঠিক তখনই অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে ত্রিপুরায় সমশের গাজীর বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল এবং স্বাভাবিক ভাবেই অধিকাংশ শ্রমিক কৃষকের সমর্থনপুষ্ট হয়ে এই বিদ্রোহ অনেকটা ফলপ্রসূও হয়েছিল।

সমশের গাজীর পরিচয়ে যতটুকু জানা যায়—দক্ষিণশিক পরগণার (বিলোনীয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত) কুঞ্জুরা গ্রামে আনুমানিক ১৭১০ খৃষ্টাব্দে সামান্য এক রমণীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন সাধারণ একজন কৃষক। অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত সমশেরের পিতা নিজের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার ভরণ-পোষণে অসমর্থ হয়ে তাঁর বালক পুত্র সমশেরকে তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন দক্ষিণ শিকের জমিদার নাশির মহম্মদের কাছে বিক্রী করে দিয়েছিলেন। নাশির মহম্মদ সমশেরের বুদ্ধিমত্তা এবং লেখা-পড়ার অনুরাগ দেখে নিজের ছেলেদের সঙ্গে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে তিনি সমশেরকে কুতঘাটের তহশীলদারের কাজে নিযুক্ত করেন। সমশের ছিলেন অসাধারণ শারীরিক শক্তি ও বুদ্ধির অধিকারী। কুতঘাটের তহশীল কাছারিতে কাজ করার সময় তাঁর সাথে গদাহোসেন খন্দকার নামে ফকিরের সাক্ষাৎকার ঘটে। এই ফকির সমশেরকে নানাভাবে বিদ্রোহে উৎসাহিত করেন।

সমশের গাজী তাঁর নিজের জীবনের চরম দুর্দশার কথা কোন অবস্থাতেই বিস্মৃত হননি। উপরন্তু জমিদার বাড়ী থেকে কৃষকের উপর সামন্ত প্রভুদের নির্মম অত্যাচার, শোষণ এবং তাদের চরম দুর্দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন অসহ্য অত্যাচার আর শোষণের জ্বালায় অস্থির হয়ে কৃষককে তার পৈতৃক ভিটেমাটি ছেড়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যেতে, তার ক্ষুধার অন্ন শোষকদের কেড়ে নিতে, নিরুপায় হয়ে তাকে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে অপরের কাছে বিক্রী করে দিতে। কুতঘাটে তহশীলদারী করতে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আরও গভীর হল। শৈশব থেকেই তাঁর সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে যে জেহাদের সূচনা হয়েছিল, তা আরও তীব্র হল। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

হলেন যে করেই হোক হতভাগ্য কৃষক শ্রমিককে এই অত্যাচার ও শোষণের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। তিনি উপলব্ধি করলেন, সংঘ শক্তি ও বাহুবলের আশ্রয় না নিলে এই চরম দুর্দশা ও ধ্বংসের কবল থেকে কৃষক শ্রমিকদের মুক্ত করা অসম্ভব। তিনি আরও উপলব্ধি করলেন, সমস্ত কৃষক শ্রমিকদের এই অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সজাগ করে দিতে হবে এবং তাদের নিয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠন করতে হবে। সেই অনুসারে কৃষক শ্রমিক যুবকগণকে বুঝিয়ে ধীরে ধীরে দল গঠন করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু শক্তি অর্জন করতে হলে এবং একটা শক্তিশালী দল গঠন করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই তিনি দক্ষিণ শিকের জমিদারী হস্তগত করতে চাইলেন এবং এর জন্য এক অভিনব ফিকিরও আবিষ্কার করলেন। তিনি জমিদার কন্যার পাণি প্রার্থনা করলেন। গীতদাসের এরূপ ঔদ্ধত্যে জমিদারের আভিজাত্যে প্রচণ্ড আঘাত লাগল এবং তাঁকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করলেন। বিপদ বুঝে সমশের সদল বলে পালিয়ে গেলেন এবং গোপনে শক্তি সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করলেন।

সমশের জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। হিন্দু-মুসলমান কৃষক শ্রমিক যুবকগণ দলে দলে সমশের গাজীর বাহিনীতে যোগদান করতে লাগল। এইভাবে সমশেরের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী গড়ে উঠল। তিনি তাদের নিয়ে গভীর বনে অস্ত্র চালনা অভ্যাস করলেন। তারপর একদিন অতর্কিতে এই বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে জমিদার নাসির মহম্মদ ও তার পুত্র নিহত হন। সমশের নিজেকে দক্ষিণ শিকের জমিদার বলে ঘোষণা করলেন।

ত্রিপুরার রাজা বিজয়মাণিক্য সমশের গাজীর এই বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া মাত্র তাঁর মন্ত্রীকে একদল সৈন্যসহ বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করেন। বিদ্রোহীদের সাথে রাজকীয়

বাহিনীর এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাজকীয় বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। রাজা বাধ্য হয়ে সমশেরকে দক্ষিণ শিকের জমিদার হিসাবে মেনে নিলেন। সমশের কয়েক সহস্র মুদ্রা নজর প্রদানপূর্বক দক্ষিণশিকের জমিদারী সনন্দ গ্রহণ করেন। বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর সাথে সাথে সমশের রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে দিলেন এবং নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করলেন। এই সময় ত্রিপুরার সিংহাসনের অধিকার নিয়ে রাজপরিবারে ঘোরতর অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সমশেরের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হল। সমশের বিদ্রোহী কৃষক শ্রমিকদের থেকে বেছে বেছে ছয় হাজার যুবক নিয়ে একটি দুর্ধর্ষ সৈন্যদল গঠন করলেন এবং তাদের যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত করে তুললেন। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য ত্রিপুরার যুবরাজ কৃষ্ণমাণিক্য কয়েকবার সৈন্যদল প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই রাজকীয় বাহিনী পরাজিত হয়। অবশেষে এই প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক শাসনের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে সমশের তাঁর সৈন্যদল নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করেন। এক ঘোরতর যুদ্ধে রাজকীয় বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে ঢাকার নবাব হাজী হোসেন সমশেরের পক্ষে সহযোগিতা করেন। যুবরাজ কৃষ্ণমাণিক্য হতাবশিষ্ট সৈন্য ও রাজপরিবারের লোকজন নিয়ে বর্তমান রাজধানী আগরতলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিদ্রোহীরা প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর অধিকার ও লুণ্ঠন করে। যুবরাজ কৃষ্ণমাণিক্য আগরতলার সুরক্ষিত আশ্রয়ে থেকে বিদ্রোহ দমনের জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু কোন প্রকারেই বিদ্রোহ দমন করতে না পেরে তিনি অবশেষে এমন একটি উপায় অবলম্বন করেন, যারফলে আগরতলা তথা ত্রিপুরার রাজ্যবাসীদের বহু ধন ও জনক্ষয় হয়েছিল। কৃষ্ণমাণিক্য বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য

পাহাড় অঞ্চলের দুর্ধর্ষ কুকীদের অর্থদ্বারা প্রলুব্ধ করেন। কুকীরা প্রচুর অর্থ পেয়ে কৃষ্ণমাণিক্যের পক্ষে বারংবার বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে, কিন্তু প্রতিবারেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে।

এই সময়ে বাংলাদেশে ভীষণ রাষ্ট্র বিপ্লব চলছিল। নবাব আলিবর্দিখাঁর মৃত্যু, তাঁর প্রিয়তম দৌহিত্র অপরিণত মস্তিষ্ক যুবক সিরাজদ্দৌল্লার অভিষেক, তদনন্তর বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের অভ্যুদয় ও হতভাগ্য নবাব সিরাজের অধঃপতন প্রভৃতি ঘটনাবলী দ্বারা যখন বাংলার অদৃষ্ট মুহুর্মুহু কম্পিত হচ্ছিল; কতকগুলি অপরিণামদর্শী স্বদেশদ্রোহী হিন্দু-মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার জনজীবন বিপর্যস্ত, ঠিক তখনই ত্রিপুরায় সমশের গাজীর এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

ত্রিপুরার শাসন ক্ষমতা সমশেরের হস্তগত হল। ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায়ের জন্য এবং প্রকৃত অবস্থা বুঝাবার জন্য কয়েক ব্যক্তিকে পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তাঁদের মধ্যে উজীর রামধন বিশ্বাসের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ত্রিপুরার রক্ষণশীল পার্বত্য প্রজারা বিশেষ করে কুকিরা সমশেরকে রাজা হিসাবে মেনে নিতে রাজী হল না। সমশের পার্বত্য প্রজাদের ইচ্ছানুসারে নিজে সিংহাসনে না বসে উদয় মাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র বনমালী ঠাকুরকে "লক্ষ্মণ মাণিক্য" নাম দিয়ে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসালেন। কিন্তু নিজে রাজা না হলেও সমস্ত ক্ষমতা সমশের নিজের হাতেই রাখলেন। গাজীনামায় উল্লেখ আছে— এই লক্ষ্মণ মাণিক্য মাত্র তিন বৎসর নামেমাত্র রাজত্ব করেছিলেন। এরপর সমশের গাজী "শ্রীশ্রীযুক্ত মহম্মদ সমশের চৌধুরী" নাম ধারণ করে ত্রিপুরার শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন।

সমতল ক্ষেত্রের প্রত্যেক পরগণায় সমশের এক এক জন শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করেছিলেন। তাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। আব্দুল রেজাক তাঁর সৈন্য বিভাগের দেওয়ান ছিলেন। বিশালঘর পরগণার শাসন ভার ছানাউল্লা নামক এক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত হয়েছিল। নুরনগর ও গঙ্গামণ্ডলের শাসন কর্তৃত্বে আব্দুল নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিভিন্ন পরগণার শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে জগৎপুরের গঙ্গা গোবিন্দ ও চৌদ্দ গ্রামের হরিশ্চন্দ্র এই দুইজন হিন্দুর নাম পাওয়া যায়। ধর্মপুর নিবাসী গঙ্গাগোবিন্দ প্রধান দেওয়ান ও খণ্ডল নিবাসী হরিহর নায়েব দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরা রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

সমশের গাজী রাজ্যের সকল দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে এমন কি ক্রীতদাসদেরও বিনামূল্যে জমি বণ্টন করেছিলেন। তিনি রাজস্বের যে ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে দরিদ্র প্রজাদের কোন কর দিতে হত না। সমশেরের আদেশে বহু গ্রামে পুষ্করিণী খনন করে দেওয়া হয়। উদয়পুর সন্নিহিত দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ডোমঘাটি নামে একটি স্থান ছিল যার বর্তমান নাম তাপরধুম বা তারপাধুম। সমশের এখান থেকে খণ্ডল পর্যন্ত একটি বাঁধান রাস্তা তৈরী করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর নিজ বাসস্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বহু ছাত্রের বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই সকল জনহিতকর কাজ করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হত। রাজস্বের দ্বারা সংগৃহীত অর্থে সমস্ত প্রয়োজন মেটানো সম্ভব ছিল না। সমশের অর্থ সংগ্রহের জন্য এক সহজ উপায় অবলম্বন করেন। অর্থের প্রয়োজন হলেই তিনি ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলের কৃপণ জমিদারগণের (যারা জন স্বার্থে এক কপর্দকও ব্যয় করত না) ধন-

ভাণ্ডার লুঠ করতেন। নোয়াখালি জেলার গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে—সমশের সময় সময় ধনী ব্যক্তিদের গৃহ লুণ্ঠন করে সেই অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন।

সংশেরের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ ঘটেছিল দেশব্যাপী এক ভয়ংকর অরাজকতার সময়। এই অরাজকতার সুযোগ নিয়ে চোরাকারবারী, মজুতদার প্রভৃতি সমাজ শত্রুরা প্রবল হয়ে উঠে। চোরাকারবারীরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম চড়াতে থাকে। সমশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেই এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সমশেরের এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে ত্রিপুরার ইতিহাস রচয়িতা কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। [অন্টাদশ শতাব্দীর ত্রিপুরার অর্থ-নৈতিক রূপরেখা, পৃঃ ১২ দ্রষ্টব্য]

শমশের গাজীর মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। কৃষ্ণমাণিক্য সমশের গাজীর এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য তৎকালীন বাংলার নবাব মীরকাশেমের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। সমশেরের নেতৃত্বে ব্যাপক প্রজাবিদ্রোহের খবর ইতিপূর্বে নবাবেরও কর্ণগোচর হয়েছিল। নবাব কৃষ্ণমাণিক্যকেই ত্রিপুরার রাজা বলে স্বীকার করেন এবং বিদ্রোহ-দমনের জন্য ইংরেজ বণিকগণের সাহায্যপুষ্ট এক বিশাল সৈন্য বাহিনী ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন। নবাবের সুশিক্ষিত এবং কামান বন্দুকে সুসজ্জিত বিশাল সৈন্য বাহিনীর সাথে যুদ্ধে সমশেরের বাহিনী পরাজিত হয়। সমশের নবাবের হাতে বন্দী হন। তাঁকে মুর্শিদাবাদের কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। তারপর ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে নবাবের হুকুমে তোপের মুখে বন্দী করিয়া সমশের গাজীকে হত্যা করা হয়। গাজী নামায় উল্লেখ আছে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা 'আগাবাখরে'র প্ররোচনায় রংপুর ঘোড়াঘাটে তোপের মুখে সমশের গাজী নিহত হন। কৃষ্ণমালার বিবরণে প্রকাশ বাংলার নবাব জাফর আলীর শাসনকালে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সমশেরকে

তোপের মুখে ফেলে হত্যা করা হয়। জয়কুমার বর্দ্ধনের মতে নবাবের গুপ্তচরেরা সমশেরকে সঙ্গে নিয়ে ফেণী নদী দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় গুপ্ত ঘাতকের হাতে সমশেরের মৃত্যু হয়। কৈলাশ সিংহের মতে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশেমের আদেশে সমশেরের প্রাণদণ্ড হয়। যেহেতু ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর কৃষ্ণমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন এবং ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে মীরকাশেম বাংলার মসনদে বসেন; সুতরাং ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দেই সমশের গাজীর মৃত্যু হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে।

সমশের গাজী ও তাঁর বিদ্রোহের মূল্যায়ন :

ত্রিপুরার ইতিহাসে সমশের গাজীকে দস্যু, ডাকাত, তস্কর ইত্যাদি বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং বহু কিংবদন্তী ও প্রবাদের মাধ্যমে ডাকাত সমশের গাজীর চিত্রই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। প্রবাদে আছে যখন সমশের দস্যু ছিলেন তখন তিনি সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করে বেড়াতেন। সেই লুণ্ঠন প্রাপ্ত অপর্যাপ্ত ধন তিনি উদয়পুরের পার্বত্য প্রদেশে অরণ্যবহুল গিরির কন্দরে লুকিয়ে রাখতেন। তাঁর লোকেরা জনৈক সূত্রধরকে নিবিড় জঙ্গলে ডেকে আনত। সেই সূত্রধরকে সঙ্গে করে তিনি একা শালবনে ঢুকতেন। বড় বড় শালগাছে এই মিস্ত্রীদের দ্বারা গর্ত করিয়ে ধন সম্পদ তার মধ্যে লুকিয়ে রাখতেন। সূত্রধররা সেই গর্তের মুখ শাল গাছের বাকল দিয়ে এমন কৌশলে বেমালুম ঢেকে ফেলত যে সে সব গর্তের কোন চিহ্নই পাওয়া যেত না। তারপর বিষয়টিকে গোপন রাখার জন্য হতভাগ্য মিস্ত্রীদের স্বহস্তে শিরশ্চেদ করতেন।

"একবার সমশের হস্তীপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিবার সময় মীরেশ্বরী নামে এক গ্রামের পুষ্করিণীতে কতিপয় স্নানরতা হিন্দু রমণীকে দেখিতে পাইয়া ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী একজনকে

বলপূর্বক হস্তীপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করেন। এই রমণী বিবাহিতা ও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিল।"

এসব লোকগাথা, কিংবদন্তীর পেছনে ঐতিহাসিক সত্যতা কতটুকু আছে তা বলা দুষ্কর। কৃষ্ণমালায় গাজীক তস্কর বলে অভিহিত করা হয়েছে। সমশের গাজীর সঙ্গে ত্রিপুরার নৃপতিগণ প্রায়ই পেরে উঠতেন না। সে কারণে ত্রিপুরার নৃপতিগণের কাছে সমশের গাজী বিভীষিকারূপে প্রতীয়মান হন। কৃষ্ণমালা কৃষ্ণমাণিক্যের আখ্যান। সেখানে বিরুদ্ধ শত্রুকে তস্কর বলে উল্লেখ করাটা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমশের গাজীর চরিত্রে দস্যুপনা বা আততায়ীর মনোভাব কতটুকু ছিল তা বিচার্য বিষয়। কৈলাশ সিংহ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন গাজী দস্যুবেশে জমিদার-গণের গৃহে প্রবেশ পূর্বক অর্থ সংগ্রহ করতেন। সমশেরের জীবনীকার শেখ মনোহর চট্টগ্রামের মিরাশা চৌধুরীর ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠনের বর্ণনায় মন্তব্য করে বলেন যে এই লুণ্ঠনের ফলেই চৌধুরীর কৃপণ স্বভাব দূর হয়। আবার দেখা যায় সমশের গাজীর শাসনকালে তিনি এরূপ কড়াকড়ি করেছিলেন যে চোর দস্যুর উৎপাত ত্রিপুরা রাজ্য হতে প্রায় অন্তর্হিত হয়েছিল। 'গাজীনামা হতে জানা যায় যে সমশের দরিদ্র প্রজাদের ভূমি-রাজস্ব মকুব করে দিয়ে নিজ মহত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। পরবর্তী-কালে কৃষ্ণমাণিক্যও বাধ্য হয়ে এই নিষ্কর বহাল রাখেন।

মীরেশ্বরী গ্রামে স্নানরতা হিন্দু নারীকে বলপূর্বক ধরে এনে বিবাহ করা এবং ঐ নারীর স্বামীকে অন্য একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে নিজ রাজ্যে উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরূপে নিয়োগ— এই কাহিনীর পেছনে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য আছে তা বলা মুসকিল। কিন্তু জয়কুমার বর্দ্ধনের 'অদৃষ্টচক্রে' আবার দেখা যায় সমশের গাজীর সমসাময়িক বসিরখার অত্যাচারে দেশ যখন উদ্ব্যস্ত তখন সমশের বসিরখাঁকে দমন করেন। সেই

সময় একদিন বসিরখাঁর অনুচরদের হাত থেকে ভবরাণী নামে এক হিন্দু মহিলাকে উদ্ধার করেন এবং ভবরাণীকে তিনি মা বলে সম্বোধন করেন। সমশের গাজীর ঐকান্তিক চেষ্টায় ভবরাণী তাঁর স্বামীকে ফিরে পেয়েছিলেন। সমশের ভবরাণীর স্বামীকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। 'অদৃষ্টচক্রের' লেখক জয়কুমার বর্দ্ধন ত্রিপুরা রাজ-সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি পুরানো সরকারী নথি-পত্র দেখে সমশের গাজীকে কেন্দ্র করে বইটি লেখেন। সেই কারণে বইটি প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত।

সমশের গাজীর রাজ্য-প্রাপ্তিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রজারাই উল্লসিত হয়েছিল। এর পশ্চাতে যে রাজনৈতিক কারণ ছিল তা জয়কুমার বর্দ্ধন উপসংহারে বলেছেন। নবাবী আমলের তখন ভগ্নদশা। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ-পরিবারে গৃহ-বিবাদ, আভ্যন্তরীণ অভাব-অনটন, জনজীবন বিপর্যস্ত প্রভৃতি কারণে প্রজাগণ নবাবী শাসন আর সামন্ত প্রভুদের শোষণ হতে মুক্তি লাভের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় সমশের ত্রাণকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রবাদ আছে, সমশের গাজী কালী সাধক ছিলেন এবং যুদ্ধের পূর্বে ব্রাহ্মণের সাহায্যে ত্রিপুরা-সুন্দরীকে পূজা দিয়ে যুদ্ধে যেতেন। এসব কাহিনীর মূলে হয়ত ঐতিহাসিক সত্য কিছু নাই, তবে সম্ভবতঃ হিন্দু-প্রজাদের সমশেরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনই এসব কিংবদন্তীর পেছনে কাজ করেছে।

সুতরাং সমশের গাজীকে ত্রিপুরার ইতিহাসে চোর, ডাকাত হিসাবে চিত্রিত করে ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করা হয়েছে এবং সমশের গাজীর প্রতি নিঃসন্দেহে অবিচারই করা হয়েছে। ডঃ বিজিতকুমার দত্ত লিখেছেন, "সমশের গাজী পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত ব্যক্তি। অন্তত আলিবর্দির রাজত্বকালে সমশের যে খ্যাতি পেয়েছিলেন তার প্রমাণ ত্রিপুরার রাজমালায় আছে। সমশের

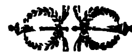
গাজীর লোকান্তরের বেশ কিছুকাল পরেও তাঁর স্মৃতি যে জনসাধারণের মধ্যে অম্লান ছিল, তার নিদর্শন রয়েছে, তাঁকে নিয়ে লেখা মীর হবিরের 'গাজী নামায়'।"

সমশের গাজী ছিলেন ত্রিপুরার কৃষক, শ্রমিক, মজদুর মেহনতি মানুষের প্রতিনিধি স্বরূপ। তাঁর এই বিদ্রোহের ফলেই ত্রিপুরার দীর্ঘ দিনের অবহেলিত, শোষিত কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র প্রজা সাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করে। প্রজা-সাধারণই যে প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, এই উপলব্ধি তাদের হয়েছিল। তারা বুঝল, জনসাধারণ ইচ্ছা করলেই শাসকের পরিবর্তন সাধন করতে পারে। সুতরাং সমশের গাজীর নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ ত্রিপুরার জনমানসে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল।

এই বিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত ত্রিপুরার সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায় নিতান্তই অবহেলিত ছিল। সমশের গাজী ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রজাদের মধ্য থেকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। এর পূর্বে কোন মুসলিম ধর্মালম্বী লোক উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিল বলে কোন নজির পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে ত্রিপুরার রাজারা এই সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের প্রতি কিছুটা উদার দৃষ্টি ভঙ্গী গ্রহণ করেন এবং ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শে কিছুটা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমশের গাজীর নেতৃত্বে যে প্রজাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল, তা ত্রিপুরার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায়। এই বিদ্রোহকেই ত্রিপুরার সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম সু-সংঘটিত সংগ্রাম হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এই সংগ্রামের ফলেই ত্রিপুরায়

সর্ব্বপ্রথম সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি কেঁপে উঠেছিল। এই সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা যায় ত্রিপুরার রাজারা পরবর্তী-কালে তাঁদের শোষণ সীমিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে নিষ্করদান, প্রজাদের উপর থেকে 'তিতুন' 'জুলাই' প্রভৃতি কু-প্রথা ও মুসলমান প্রজাদের উপর আরোপিত 'কাজিয়ানা করের' বিলোপ সাধন এবং ভূমি-রাজস্ব হ্রাস করা হয়। ত্রিপুরায় সমশের গাজীর নেতৃত্বে যখন বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র শীর্ষ-বিন্দুতে অবস্থান করছে। এই অবস্থায় ত্রিপুরার মত ছোট রাজ্যে বিচ্ছিন্ন-ভাবে সামন্ততন্ত্রের মুলোৎপাটন করা সম্ভব ছিল না। সমশের গাজীর নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শুভ সূচনা করেছিল মাত্র। সুতরাং রাজনৈতিক আদর্শের দিক দিয়ে এই সংগ্রাম ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।



একালের উল্লেখযোগ্য ব্যবসাকেন্দ্র ফটিকরায় : অতীত ও বর্তমান।

ফটিকরায় নামটা অনেকের কাছেই সুপরিচিত, বিশেষ করে যারা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। উত্তর ত্রিপুরায় কৈলাসহর মহকুমায় অবস্থিত মনুনদী দিয়ে ঘেরা অঞ্চলটির নাম ফটিকরায়। এর অনেক প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। বিশেষ করে 'ফটিকরায়' নামটাই অঞ্চলের অতীত ঐতিহ্য বহন করছে। স্বাভাবিকভাবেই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এই 'ফটিকরায়' নামটা কি

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ ইং, ১২ই পৌষ, ১৩৮৫ বাং দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত।

করে এল। এই নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে হলে এর ইতিহাস সম্পর্কে অল্প একটু আলোচনা করা দরকার। ত্রিপুরায় তখন কল্যাণ মাণিক্যের রাজত্বকাল (১৬২৬—১৬৫৯)। তাঁর রাজত্বকালে বেশ কয়েকবার মোঘলদের সাথে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। এবং প্রতিবারই মোঘলরা প্রতিহত হয়েছে। কিন্তু রাজত্বের শেষ দিকে একবার মোঘলদের সাথে যুদ্ধে তাঁর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। পরিণামে সমস্ত কৈলাসহর বিভাগ তার হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মোঘলদের হস্তগত হয়। তখন দিল্লীর সিংহাসনে মোঘল সম্রাট শাজাহান আর বাংলার শাসন কর্তা সুলতান সুজা। কৈলাসহর বিভাগের শাসনকার্য শ্রীহট্টের মোঘল শাসনকর্তার প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে আনা হল। সমস্ত কৈলাসহর বিভাগের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একজন 'কারকোন' নিযুক্ত করা হল। এই কারকোনকে স্থানীয়ভাবে 'কানকোই'ও বলা হত। এই কারকোন বা কানকোই এর সদর কার্যালয় ছিল ফটিকরায়। সোনা রায়ের পুত্র ফটিক রায় ছিলেন একজন কারকোন। তার নাম অনুসারেই এই অঞ্চলের নাম হয় ফটিকরায়। কৈলাসহর বিভাগ যতদিন পর্যন্ত মোঘলদের অধীনস্থ ছিল ততদিন এই ফটিকরায়ই ছিল এই বিভাগের সদর কার্যালয়। রাম মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৬৭৬—১৬৮৫) সের মুস্তাফা এবং অমল খাঁ নামে দুই পাঠান যোদ্ধা আর কিছু সৈন্য সামন্ত সাথে দিয়ে তিলক রায়কে দমন করার জন্য পাঠান হয়। তিলক রায় ছিলেন ফটিকরায়ে নিযুক্ত সর্বশেষ কারকোন। ত্রিপুরার সৈন্যদের দ্বারা অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে তিলক রায় সপরিবারে নিহত হন।

ভাবতে অবাক লাগে তিনশ বছরেরও আগে আজকের এই ফটিকরায় সমস্ত কৈলাসহর বিভাগের (আয়তন বর্তমানের চেয়ে আরও বড় ছিল) সদর কার্যালয় ছিল। যারা কয়েক যুগ

ধরে ফটিকরায়ে বসবাস করছেন, তাদের আক্ষেপ করতে শোনা যায় 'আহা! ফটিকরায় কী ছিল, আর কী হল'। আজ থেকে ২০/২৫ বছর আগেও ফটিকরায় যা ছিল, তার অনেক কিছুই আজ বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে। কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক প্রাচীন লোক তার স্মৃতি আজও ধরে রেখেছেন। এই ফটিকরায়েই ছোট-খাট একটা পাট কল ছিল। ছাতির বাট তৈরীর কারখানা ছিল। ছেলেবেলায় এই প্রবন্ধকারের এইগুলি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল। এককালে ফটিকরায় ত্রিপুরায় একট উল্লেখযোগ্য ব্যবসাকেন্দ্র ছিল। ফটিকরায় বাজারের মত এত বড় বাজার খুব কমই চোখে পড়ে। ২০/২৫ বছর আগেও এখানে সোমবারে যে হাট বসত তাতে এত লোক সমাগম হত এবং এত জিনিসপত্রের আমদানী হত যে এত বড় হাট ত্রিপুরায় আর কোন গ্রামাঞ্চলে বসে কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর এই হাটে যে গরুর বাজার বসত খুব সম্ভব তা উত্তর ত্রিপুরায় সবচেয়ে বড় গরুর বাজার ছিল। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন এসে এই হাট থেকে গরু কিনত। এখনও অবশ্য সোমবার এবং বৃহস্পতিবার হাট বসে তবে আগের মত জনসমাগম ও জিনিস পত্রের আমদানী আর হয় না। কয়েক বছর আগেও এখানে শুল্ক দপ্তরের অফিস, বড় থানা, বন দপ্তরের অফিস প্রভৃতি ছিল যা বর্তমানে অতীতের স্মৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য এগুলির ভগ্নাবশেষ এখনও একেবারে মুছে যায়নি, যা মাঝে মাঝে অতীত স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। থানা অবশ্য এখনও ফটিকরায় নামটা মুছে ফেলতে পারেনি, ফটিকরায় থানা নাম নিয়েই পাশের একটা গ্রামে (সায়দা বাড়ী) স্থানান্তরিত হয়েছে।

সভ্যতা সংস্কৃতি তো এগিয়ে চলছে। কিন্তু ফটিকরায়ের দিকে তাকালে ঠিক উলটোটাই মনে হয়। ফটিকরায়ে সভ্যতার

আলো যেন দিন দিন নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। অফিস কাছারী-গুলো ধীরে ধীরে পা গুটিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হচ্ছে। এক কালের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রের দিকে তাকালে সত্যিই দুঃখ না করে উপায় নেই। দোকানপাটের সংখ্যা অবশ্য আগের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে। তবে এখানকার ব্যবসায়ীরা জীবন্ত ধৈর্য্যের প্রতীক। ছোট-খাট অনেক দোকানীই দিনের বেলায় বসে বসে মাছি তাড়ান— মাঝে মাঝে দু-একজন খরিদদার যদিও বা আসে। আর সন্ধ্যা হলেই দোকান ঘরগুলি টিম টিম করতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে দোকানের ঝাঁপ নেমে আসে। তবে অনেকেই পাট গুটিয়েছেন; আবার অনেকে নতুন আশায় পাট খুলেছেন। জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া। অবশ্য ব্যবসায়ীদের এর জন্য খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। কেন না ফটিকরায় পর্য্যন্ত তাদের মাল পৌঁছাতে বেশ কিছু অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়। অবশ্য সুযোগ পেলে ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিকভাবেই মুনাফা একটু বেশী নিয়ে থাকে। আর ফটিকরায়ে তো সেই সুযোগের অভাব নেই।

সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা। সাধারণতঃ কোন যানবাহন এখানে আসে না, তবে নির্বাচনের প্রাক্কালে মাঝে মাঝে দু'একটি জীপ গাড়ী দৃষ্টিগোচর হয়। এছাড়া কদাচিৎ সরকারী গাড়ী অথবা কোন কোন ব্যবসায়ী গাড়ী দেখা যায়। এখনও ফটিকরায়ের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে একটা ভাঙ্গা জীপ-গাড়ী দর্শনীয় বস্তু। এ থেকে সহজেই অনুমেয় ফটিকরায়ের প্রগতি কোন দিকে বইছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে ফটিকরায়বাসীর সবচেয়ে করুণ অবস্থা হয়। ফটিকরায় থেকে কুমারঘাট পায়ে হাঁটা—যে কাঁচা রাস্তা তাতে প্রতিদিন বহুলোক যাতায়াত করে। বর্ষাকালে এক হাঁটু কাঁদা ভেঙ্গে কুমারঘাট পৌঁছাতে হয়। বহুকাল ধরেই এইভাবে

কাদা ভেঙ্গে পথচারী পথ চলছেন। এলাকাবাসীদের মধ্যে অনেকেই কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষকরা তাদের পণ্যের উচিত মূল্য থেকে বঞ্চিত। যোগাযোগের অব্যবস্থার দরুণ তাদের নির্ভর করতে হয় ব্যাপারী ও ফড়েদের উপর। আর চাষ—সেই মান্ধাতা আমলের মতই হয়ে আসছে। সরকারী অফিসাররা যেহেতু এসব অবহেলিত অঞ্চলে যেতে চান না—সরকারী আনুকূল্যে আধুনিকসম্মতভাবে চাষও হতে পারছে না। সেচ ব্যবস্থা নেই, তাই ফলন ভাল হয় না।

গত ৩০ বছরে অবস্থার উন্নতি বলতে ফটিকরায় বাজারে কয়েকটা 'সেড' হয়েছে, রাস্তার সংস্কার সাধন করা হয়েছে, আর গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পের ফলশ্রুতি হিসাবে এখানে বিদ্যুৎ এসেছে। সম্প্রতি গ্রামীন ব্যাংকের একটি শাখারও উদ্বোধন করা হয়েছে। ফটিকরায় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সুন্দর দালান উঠেছে। এলাকাবাসী কয়েকজন ব্যক্তির নেহাৎ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতেই তা সম্ভব হয়েছে।

ফটিকরায়ে দাঁড়িয়ে অতীত এবং বর্তমানকে পাশাপাশি রেখে যদি একটু পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে যে কেউই ফটিকরায়ের জন্য সত্যিই দুঃখ করবে। আধুনা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন। রাতারাতি ফটিকরায়ের সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তবে ফটিকরায়বাসী নিশ্চয় আশা করবে, এই সরকার অচিরেই এই অবহেলিত অঞ্চলের অবহেলার অবসান ঘটাতে সচেষ্ট হবেন।



ত্রিপুরার কুকি সম্প্রদায় : সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।

ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল বহু প্রাচীন উপজাতি ও মিশ্র উপজাতির আবাসস্থল। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে বিভিন্ন পার্বত্য উপজাতিরা একসময়ে সমতল ক্ষেত্রেই বাস করত। কিন্তু কালক্রমে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর শাখা-প্রশাখার সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে পরাজিত হয়ে এরা পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং স্থানীয় আবহাওয়া ও অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করে পার্বত্য অঞ্চলেই বসবাস শুরু করে। আবার অনেকে মনে করেন, এদের আদিম বাসস্থান পর্বতময় ছিল। ফলে এরা পার্বত্য অঞ্চলকেই বসবাসের জন্য বেছে নিয়েছিল। এই উপজাতিদের মধ্যে কুকি সম্প্রদায় অন্যতম। কুকিরা মঙ্গোলয়েড নামক এক বৃহৎ মানব গোষ্ঠীর শাখা। ত্রিপুরায় বসবাসকারী কুকিদের প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— 'দারলং কুকি' এবং 'রখুম কুকি'। দারলং কুকিদের বলা হয় 'মার-মি' অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলের লোক। আবার রখুম কুকিদের বলা হয় 'সিম-মি' অর্থাৎ দক্ষিণাঞ্চলের লোক।

কুকিরা ঠিক কখন ত্রিপুরায় এসেছিল, এ ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। তবে অনেকে মনে করেন, কুকিদের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন সময়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিল। শ্রীরামগোপাল সিং তাঁর 'Kuks of Tripura' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে কুকিদের যে শাখা ত্রিপুরায় প্রবেশ করে, তারা ত্রিপুরার রাজার বশ্যতা স্বীকার করে এবং পরবর্তীকালে 'হালাম' নামে পরিচিত হয়। এই হালামরা ত্রিপুরায় 'মিলা কুকি' নামে খ্যাত। কুকিদের অন্যান্য শাখা যা পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে, তারা হল দারলং এবং লুসাই। কুকি এবং লুসাই—শব্দগত দিক দিয়ে

পার্থক্য থাকলেও জাতিগত-ভাবে কোন পার্থক্য নেই।

অনেকে মনে করেন হালাম শব্দটি 'হা' (মাটি) এবং 'লামা' (পথ)—এই শব্দ দুইটি থেকে এসেছে। ত্রিপুরা ত্রিপুরীদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার পূর্বে কুকিরা যাযাবরের মত একস্থান হতে অন্যস্থানে জুমচাষ করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করত। মাটির পথই ছিল তাদের জীবনের অবলম্বন। তাই তারা পরবর্তীকালে নবাগতদের কাছে হালাম নামে পরিচিত হল। অবশ্য অনেকে ভিন্ন মতও পোষণ করেন। হালামগণ যে কুকি বংশোদ্ভূত সে সম্পর্কে ১৩৪০ ত্রিং (১৯৩১ ইং) সেন্সাস বিবরণীতে বলা হয়েছে, "হালামগণ কুকির একটি শাখা। যে সকল কুকি প্রথমতঃ ত্রিপুরেশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহারাই হালাম নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাদিগকে মিলা কুকি বলে। ইহারা শিবের সন্তান বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।" ব্রজেন্দ্র দত্ত "ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর" (ধর্মনগর বিবরণ) গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত রেখেছেন। "The Tribes of Tripura" গ্রন্থেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

রাজমালায় উল্লেখ আছে, ত্রিপুর রাজবংশীয়দের অধিকৃত হওয়ার পূর্বে ত্রিপুরা 'কিরাত'দের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। এই কিরাতরাই পরবর্তীকালে কুকি নামে আখ্যাত হয়। আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর Kirata Janakirti (Vol. XVI, No 2 J R A S B page—173) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

"The Kukichin tribes present an important branch or section of the Assam Indo-Mongoloids. They have kinsmen in Burma and appear to have settled in a fairly ancient times in Manipur and Lushai Hills as well as in the Chittagong hills tracts From Lushai and Monipur they

came in large number to Tripura State, where they formed an important section of the people. These Indo-Mongoloids are known to the Assamese and Bengalees as Chain and Kuki Chin, has been adopted as a composite and inclusive name for them"

এদের জাতীয় সাধারণ নাম 'খমাক'। পূর্ব্ববঙ্গবাসী বাঙ্গালীরা এদের নাম দিয়েছিল 'কুকি'। আসামের কাছাড়ীরা এদের নাম দিয়েছিল 'লুছাই' এবং পরবর্তীকালে ইংরেজরা এদের নাম রেখেছিল 'লুসাই'। ককবরক ভাষায় কুকিদের বলা হয় 'ছিকাম', মণিপুরী ভাষায় বলে 'খংজাইস'। কুকি ভাষাতেও কুকির প্রতিশব্দ 'হু-য়েম'। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের কুকি অথবা লুসাই নামে পরিচয় দিতে কোন প্রকার গর্ব বোধ করে না, বরং কিছুটা সংকোচিত হয়। তারা সাধারণতঃ তাদের প্রধান বা বিখ্যাত দলপতির নামানুসারেই নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে। 'লুছাই' শব্দটি বিশেষ অর্থব্যঞ্জক। 'লু' অর্থ মাথা, আর 'ছাই' অর্থ কাটা। যারা মাথা কাটে তারাই লুছাই। T.H. Lewin তার "Hill tracts of Chitagong and dwellors therein" গ্রন্থে অনুরূপ মত পোষণ করলেও Lt. Colonel J. Shakespear তাঁর "The Lushei Kuki Clans" গ্রন্থে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তার মতে কেবলমাত্র নরমুণ্ড শিকারই কোন গ্রাম আক্রমণের পেছনে লুসাইদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। তারা নানা জনপদ আক্রমণ করত সাধারণতঃ লুণ্ঠন এবং দাস-দাসী সংগ্রহের জন্য। তারা যুদ্ধে বিজিত শত্রুর মস্তক ছিন্ন করে নিয়ে আসত কৃতিত্ব ও সামাজিক স্বীকৃতির জন্য। প্রকৃতপক্ষে লুসাই বলতে বহু পরিবারের লোকদের বুঝায়। লুসাই হল বংশের নাম। এই বংশ খঙ্গুর, পছুআও, ছংতে,

ছোংতে, ছোংআছেং প্রভৃতি অনেক পরিবারে বিভক্ত। আর প্রত্যেক পরিবারেও রয়েছে বেশ কয়েকটি শাখা।

১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) ত্রিপুরা রাজ্যের সেন্সাস বিবরণীতে উল্লেখ আছে, পইতু, বেনটুট, থাংলুয়া, লাইকং, বংখই, মিপেল, নামতে, ছাল্যা- যুন, বুনতেই, নেনতেই, জংতেই, বাংচন, খারং প্রভৃতি দফা বা সম্প্রদায়ের লোকেরা কুকি। অবশ্য প্রথম পাঁচটি দফার কুকিই ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করছে। এই রাজ্যের কুকিরা সাধারণতঃ দারলং ও লুসাই নামেই অভিহিত হয়ে থাকে। দারলংরা যাঙ্গুর এবং পছুআও এই দুই ভাগে বিভক্ত। যাঙ্গুররা উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করে থাকে। যাঙ্গুররা আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত, যথা— ক) যান-রিং-বাওং, খ) বাওলটে, গ) রাণটে, ঘ) জেঠে, ঙ) ইনভাং, চ) হামটে, ছ) যাংসা, জ) সোয়ান, ঝ) ছোয়াংকল। পছুআওরা ও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত যথা— ক) ছুইংগো, খ) ছুইহাং, গ) জেকেং, ঘ) খালরিং, ঙ) রংখুম ইত্যাদি।

১৯৭১ সালের সেন্সাস বিবরণী অনুসারে ত্রিপুরার কুকিদের সংখ্যা ৭,৭৭৫ জন। ইহারা সাধারণতঃ ত্রিপুরার কৈলাসহর, ধর্মনগর, খোয়াই, উদয়পুর, কমলপুর, অমরপুর এবং সদর মহকুমায় বসবাস করছে। এর মধ্যে কৈলাসহর মহকুমায় সর্বাধিক কুকি জনবসতি (৩,২২৭)। ত্রিপুরার উপজাতি জনসমষ্টির (৪,৫০,৫৪৪) শতকরা ১'৭২ জন কুকি। শিক্ষার দিক দিয়ে ইহারা অন্যান্য উপজাতিদের তুলনায় অনেকটা অনগ্রসর। কুকিদের মধ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা ১২.১৬ জন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সমগ্র কুকি উপজাতি প্রতাপশালী ত্রিপুরার রাজগণের অধীনতা পাশে আবদ্ধ ছিল। ত্রিপুরার রাজাদের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ উৎপীড়নে অস্থির হয়ে

এই স্বাধীনতাপ্রিয় উপজাতি নিজস্ব স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের শাসনকালে পইতু কুকিদের প্রধান সর্দার শিববুত বহু কুকি পরিবার নিয়ে ত্রিপুরার মহারাজার অধীনতা পাশ ছিন্ন করে এবং নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে এদের একাংশ আবার ত্রিপুরা রাজ্যে ফিরে এসে ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। অপর অংশ পার্বত্য প্রদেশে নিজেদের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল। এদের মধ্যে ত্রিপুরার পূর্ব্ব ও উত্তরাঞ্চলবাসী পইতু কুকিরা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ।

বর্তমানে কুকিরা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। এদের একাংশমাত্র পার্বত্য ত্রিপুরার অধিবাসী। অন্যান্য উপজাতি হতে এদের আকৃতি একটু ভিন্নরূপ। এদের গায়ের রঙ একটু মলিন, উন্নত নাসিকা পাতলা ওষ্ঠ। মাঝে মাঝে ঘন কৃষ্ণ দাড়ি-গোফও পরিদৃষ্ট হয়। এদের জীবনযাত্রা খুব সরল। সাধারণতঃ পাহাড়ের চূড়ায় ৫′ থেকে ৬′ (ফুট) উঁচু বাঁশ ও বেতের দ্বারা নির্মিত ঘরেই এরা বসবাস করে। প্রতিগৃহে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন লোক বাস করে। এক-একটি বাড়ী এক-একটি গ্রামের মত। এদের সমাজ বন্ধন খুব দৃঢ়। সামাজিক নিয়মের লঙ্ঘনের জন্য কঠোর দণ্ডবিধান করা হয়। প্রতি সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি ঐ সম্প্রদায়ের রাজা। কুকি রাজাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হলেও যুদ্ধের সময় তাদের ক্ষমতা অসীম।

জুমচাষই এদের প্রধান উপজীবিকা। জুমচাষের জন্য তারা নভেম্বর / ডিসেম্বর মাসে জঙ্গলের একটা অংশকে কেটে পরিষ্কার করে। মার্চ / এপ্রিল মাসে সেই শুকনো জঙ্গলকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। তারপর প্রথম বৃষ্টির পরই 'তাক্কল' দিয়ে গর্ত করে ধান, পাট, গম ইত্যাদির বীজ বপন করে। এর জন্য অন্য কোন প্রকার চাষের দরকার হয় না।

রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় জুমচাষের জন্য জুমিয়াদের কোন কর দিতে হত না। পরিবর্তে তাদের পরিবার পিছু ১ টাকা থেকে ৮ টাকা পর্যন্ত ঘরচুক্তি খাজনা দিতে হত। অবশ্য রাজ-কর্মচারীরা ঘরচুক্তি খাজনা থেকে মুক্ত ছিলেন। কুকিরা রাজার সেনাবাহিনীতে কাজ করত। তাই অনেক সময় সেনাবাহিনীতে কাজ করবে এই শর্তে কুকিদের সর্বপ্রকার খাজনা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হত। পূর্বে কুকিরা খুব সহজ সরল জীবন-যাপন করত। তাদের অর্থনীতি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। একমাত্র লবণের জন্য তাদের নিকটবর্তী বাজারের উপর নির্ভর করতে হত। আর ঐ সকল বাজারে তাদের জুমে উৎপন্ন পণ্য সামগ্রী বিক্রী করত। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তিত হল। তাদের জীবন-যাত্রা এবং অর্থনীতিতে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হল। অনেকে মনে করেন তাদের জীবন-যাত্রা এবং অর্থনীতির এই ব্যাপক পরিবর্তনে খ্রীষ্টধর্ম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। বর্তমানে কুকিদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ী কৃষিকার্য করে জীবিকা নির্বাহ করছে। কিন্তু তাদের পক্ষে জুমচাষ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা সম্ভব হয়নি, কারণ তাদের জীবন যাত্রা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সংস্কৃতিতে জুম কৃষি পদ্ধতি ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

যে সমস্ত খাদ্য খেলে রোগ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদি প্রতিরোধ করা যায়, সে সকল খাদ্যই সাধারণতঃ তারা গ্রহণ করে। তবে মাংসই এদের প্রিয় খাদ্য। হরিণ, শশক, হাতী, ঘোড়া, বানর, বিড়াল, অজগর, ব্যাঙ প্রভৃতির মাংসই এরা আহার করে থাকে। পশু পক্ষী শিকার কুকিদের অর্থনীতিতে একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শিকারের মধ্যে তাদের সবচেয়ে প্রিয় হাতী শিকার। কিন্তু বর্তমানে সরকারী নিষেধাজ্ঞার ফলে কুকিদের মধ্যে শিকারের প্রবণতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীলোকেরাই অধিকতর স্বাধীন। অনেক

পুরুষই স্ত্রীলোকের উপর নির্ভরশীল। রমণীরা সাধারণতঃ সাজ-সজ্জা ভালবাসে। তারা গলায় এক বিশেষ ধরণের মালা পরে, তাকে তারা 'মিসি' বা 'রাথই' বলে। এছাড়া গলায়, হাতে নানা ধরণের পাথরের মালা, হাতীর দাঁতের অথবা মহিষের শিং এর চুড়ি পরিধান করে। তবে কাপড়ের সাজ-সজ্জার প্রতি আকর্ষণ তুলনামূলক-ভাবে কম। কুকি রমণীরা নিজেদের তৈরী 'পাছরা' (নাতিদীর্ঘ একখানা কাপড়) পরিধান করে এবং বুকে একখণ্ড কাপড় 'রিয়া' বেঁধে রাখে। কিছুকাল আগেও কুকি পুরুষরা সূতি কাপড়ের একখণ্ড 'ল্যাংটি' পরিধান করত, যাকে তাদের ভাষায় বলা হয় 'মসল-রেম'। কালক্রমে কুকিদের অনেকেই 'পমপুর' (সার্ট) এবং 'পনসেং' (ধূতি) পরিধান করতে অভ্যস্ত হল। বর্তমানে বিশেষ করে তাদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবের ফলে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসে মেয়েরা স্কার্ট-ব্লাউজ এবং লম্বা গাউন পরিধান করে। পুরুষরাও অন্যান্য-দের মত সার্ট-পেন্ট পরিধান করে। মেয়েরা সাধারণতঃ কালো রঙ-এর গাউন, ফ্রক ইত্যাদি অধিক পছন্দ করে।

কুকিরা সাধারণতঃ নিজেদের সম্প্রদায়ের বাইরে কোন বৈবাহিক সম্পর্ক করে না। বিবাহে কোন প্রকার সামাজিক রীতি-নীতি পালন করা হয় না। ছেলে-মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হলেই বিবাহ দেওয়া হয়। কোন অবিবাহিত ছেলে এবং মেয়ে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হলে, তাদের অভিবাবকরা একজন মধ্যস্থতাকারী মাধ্যমে পরস্পরের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। তাদের কাছে সমস্ত বৎসর দুইটি ঋতুতে বিভক্ত, যথা—'থাল' অর্থাৎ শুষ্ক ঋতু এবং 'ফার' অর্থাৎ বর্ষা ঋতু। অগ্রহায়ণ মাসকে তারা 'থালা থাল' বলে। তাদের বিশ্বাস, অগ্রহায়ণ মাসে কোন বিবাহের প্রস্তাব পাঠানো অকল্যাণ কর। বিবাহের প্রস্তাব সাব্যস্ত হলে ছেলের বাবা মেয়ের বাবাকে বিবাহের চুক্তির নিদর্শন হিসাবে

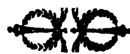
৮ টাকা প্রদান করেন। বিবাহের জন্য দুই বোতল দেশী মদ এবং একটি মোরগ প্রয়োজন হয়। ওঝাই নবদম্পতির মঙ্গল কামনা করে, কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করেন। তারপর নাচ, গান, ভোজ এবং মদ্য-পানের মধ্য দিয়ে বিবাহ উৎসব পালন করা হয়। বিধবারা ইচ্ছা করলে পুনরায় বিবাহ করতে পারে। তবে স্বামীর মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে কোন বিধবা পুনরায় বিবাহ করতে পারে না। বর্তমানে খ্রীষ্টান কুকিদের বিবাহ সাধারণতঃ চার্চেই হয়ে থাকে। চার্চ কর্তৃপক্ষ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে এই মর্মে নবদম্পতিকে সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন। বিবাহের পরবর্তীকালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য হলে উভয়ের সম্মতি নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদও হতে পারে। কারণ বিবাহ তাদের কাছে একটি সামাজিক চুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। সামাজিক কঠোরতার কারণেই হয়ত সামাজিক ব্যভিচার কম। অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ব্যভিচার যদিও খুব একটা দোষের নয়, কিন্তু বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ব্যভিচারের জন্য কঠোর সামাজিক দণ্ড বিধান করা হয়।

কুকিরা পরম-কল্যাণময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে। এই কারণে তাদের দলপতির মৃত্যু হলে মৃতদেহের সাথে সমতলবাসী লোকদের মাথা কেটে সমাহিত করা হয়। তাদের বিশ্বাস, মৃতদেহের সাথে যত বেশী কাঁটা মাথা দেওয়া যাবে, মৃতের পরবর্তী জীবনে তত বেশী সুখ হবে। কুকিরা রোগ, মহামারী এবং সমস্ত অশুভশক্তির দেবতা 'পাথিয়াল' এর পূজা করে। এই পূজা যিনি করেন, তাকে বলা হয় 'থিয়ামপু'। এছাড়া তারা তরপা বা শিব, লক্ষ্মী, ইন্দ্রই, রোদনা, তাওয়াল-পাথিয়েন, দাইরই, খাওয়াহুলাল এবং জুম পূজা ইত্যাদি করে থাকে। বর্তমানে যুবকদের মধ্যে অধিকাংশই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত

হয়েছে। কাজেই তারা খ্রীষ্টধর্মীয় রীতি-নীতিতেই অভ্যস্ত।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে সভ্যতার অগ্রগতির অনুপাতে কুকিরা আজ অনেক বেশী পশ্চাৎপদ। আজ পৃথিবীর সর্বত্রই ধনতন্ত্র ধ্বংসপ্রায়। সমাজতন্ত্রকে কায়েম করার জোর সংগ্রাম চলছে। কিন্তু কুকি তথা উপজাতিরা এখনও তাদের প্রাক্-সামন্তযুগীয় অর্থনীতিকে আকড়ে ধরে আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপ ছাড়া এই নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে পতনোন্মুখ উপজাতিদের রক্ষা করা সম্ভব নয়। ত্রিপুরায় বিভিন্ন সময়ে উপজাতিদের স্বার্থে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সত্য, কিন্তু ঐগুলি প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই দুর্বল। ডাবর কমিশনের সুপারিশ অনুসারে উপজাতিদের উন্নয়নকল্পে অনেক-গুলি Tribal Development Block গঠন করা হয়েছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে Block-গুলি গঠন করা হয়েছিল, তা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। অধুনা উপজাতিদের জমি হস্তান্তর, স্বয়ংশাসিত উপজাতি জেলা পরিষদ গঠন ইত্যাদি ব্যবস্থা সরকারী উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। স্বয়ংশাসিত উপজাতি জেলা পরিষদ গঠন করে উপজাতিরা নিজেদের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিজেরা উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এতে তাদের লুপ্ত-প্রায় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটবে এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এছাড়া আশু যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে, তা হল— আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষি পদ্ধতিতে যাতে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠে, সেই জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং সরকারী সাহায্য সহায়তার ব্যবস্থা করা দরকার। দালাল, ফরিয়া ব্যবসায়ী এবং মজুতদারদের কবল থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য তাদের উৎপাদিত পণ্যের

যাতে উপযুক্ত মূল্য পায়, সেদিকে সরকারী দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বিনামূল্যে বীজ, সার, চারাগাছ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কৃষি-সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারলে দারিদ্রের পীড়ন থেকে হয়ত তারা কিছুটা অব্যাহতি পেতে পারে। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে যাতে তারা অন্যান্যদের সাথে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চলতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। পরিশেষে বলা উচিৎ এই সহজ সরল নিরীহ উপজাতির উপর সময় মত উপযুক্ত দৃষ্টি না দিলে, অতীতের মত ভবিষ্যতেও এদের ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশ পেলে, নিঃসন্দেহে সমগ্র জাতির অমঙ্গলই ডেকে আনবে।



সংবিধানের পঞ্চম তপশীল ও ত্রিপুরার উপজাতি সমস্যা।

সংবিধানের ২৪৪ ধারায় বিশেষ ব্যবস্থা আছে যে কোনও অনগ্রসর অঞ্চল তা যে কোন অঙ্গরাজ্য অথবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে থাকুক না কেন সেই অঞ্চলকে Soheduled areas এবং সেই অঞ্চলের উপজাতি আদিবাসীদের Scheduled tribes হিসাবে ঘোষণা করা যেতে পারে। পঞ্চম তপশীলের ৬—৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে রাষ্ট্রপতি সংসদের আইন প্রণয়ন সাপেক্ষে যে কোন অঞ্চলকে তপশীলভুক্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন। সেই অনুসারে রাষ্ট্রপতি ১৯৫০ সনে Soheduled areas Part A States and Part B States

১৮ই এপ্রিল, ১৯৭৮ ইং, ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৮৫ বাং ত্রিপুরা দর্পন পত্রিকায় প্রকাশিত।

order—এ বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িষ্যা, পাঞ্জাব গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের ৯৯৬৯৩ বর্গমাইল তপশীলভুক্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করেন এবং ৮৬ লক্ষ উপজাতি (১৯৫১ সেন্সাস) উক্ত এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়।

সংবিধানের ২৪৪ (১) ধারায় বলা হয়েছে— "The provision of the fifth Schedule shall apply to the administration and Control of the Scheduled areas and Scheduled tribes in any State other than the State of Assam."

পঞ্চম তপশীলে উল্লেখিত তপশীলভুক্ত অঞ্চলের প্রশাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:— কেন্দ্র তপশীলভুক্ত অঞ্চলের প্রশাসনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যকে নির্দেশ দিতে পারে [Art ৫৩৯ (২)]। উপজাতিদের নিয়ে একটি "Advisory Council" গঠন করতে হবে এবং তা রাজ্যের উপজাতিদের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধির জন্য রাজ্যপালকে সুপারিস করতে পারবে। রাজ্যপাল এইরূপ নির্দেশ জারি করতে পারেন যে সংসদের কোন বিশেষ আইন অথবা রাজ্য বিধানসভার কোন আইন তপশীলভুক্ত অঞ্চলে প্রযোজ্য হবে না অথবা কেবলমাত্র সংশোধন সাপেক্ষে এটার অংশ বিশেষ প্রযোজ্য হতে পারে। রাজ্যপাল উপজাতিদের জমি হস্তান্তর, ভূমি বন্দোবস্ত, সুদ কারবারিদের শোষণ ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারেন। অবশ্য এরূপ নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন।

পঞ্চম তপশীলের ৭ (২) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে সংসদ প্রয়োজনে তপশীলভুক্ত অঞ্চল-এর তপশীলভুক্ত উপজাতির প্রশাসনের ব্যবস্থাগুলি সাধারণতঃ আইন প্রণয়ন দ্বারা পরিবর্তন করতে পারেন। সংবিধানের ৩২৯ (১) ধারা বলে রাষ্ট্রপতি শ্রীদেবরকে চেয়ারম্যান করে ১৯৬০ সালের ২৮শে এপ্রিল

The Scheduled areas and Scheduled tribes Commission নিযুক্ত করেন এবং এই কমিশন ১৯৬১ সনের শেষদিকে রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট পেশ করে। এই কমিশন পঞ্চম তপশীলে উল্লেখিত তপশীলভুক্ত অঞ্চলের প্রশাসন ব্যবস্থা বিশেষ করে ট্রাইবেল এডভাইজারী কাউন্সিল-এর কাজ-কর্ম, তপশীলভুক্ত অঞ্চলে প্রযোজ্য আইন, পঞ্চম তপশীলের পঞ্চম অনুচ্ছেদে উল্লেখিত রাজ্যপালের ক্ষমতা, তপশীলভুক্ত অঞ্চল ঘোষণার নীতি, তপশীলভুক্ত উপজাতিদের কল্যাণ প্রভৃতির উপর report পেশ করে। কতক রাজ্য সরকার কিছু সংখ্যক নূতন অঞ্চলকে তপশীল-ভুক্ত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কমিশন তপশীলভুক্ত অঞ্চলের পরিবর্তে alternative programme"-এর সুপারিশ করেছে। এই কমিশনের মতে উপজাতিরা পঞ্চম তপশীলের অধীনে যে "সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা সমস্তুই এই 'alternative programme' দ্বারা লাভ করবেন এবং যদি এই 'alternative programme' সরকারের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হয় কেবলমাত্র তখনই নতুন অঞ্চলকে তপশীলভুক্ত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।. এই অন্তর্ভুক্তিকরণের ব্যাপারে কমিশন তাঁর রিপোর্ট-এর ৫৮ পৃষ্ঠায় কয়েকটি স্তর এর উল্লেখ করেছেন। স্তরগুলি যথাক্রমে :—

ক) উপজাতির সংখ্যাধিক্য।

খ) বসবাসের নিবিড়ত্ব এবং অঞ্চলের যুক্তিযুক্ত আকৃতি।

গ) অঞ্চলের অনুন্নত প্রকৃতি।

ঘ) উপজাতিদের অর্থ-নৈতিক অবস্থায় সুস্পষ্ট অসাম্য।

কমিশন সুপারিশ করেছেন যে রাজ্য সরকার উপজাতিদের অধিকার সংরক্ষণ এবং সুদ কারবারিদের শোষণ থেকে উপজাতিদের রক্ষা করবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। উপজাতিদের

সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য তাদের এক একটি উপজাতি উন্নয়ন ব্লক-এর অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। এই ব্লকগুলি উপজাতিদের অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষার বিস্তার, স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এই চার প্রকার কাজ বিশেষ ভাবে সম্পাদন করবে। কমিশনের রিপোর্ট-এ আরো বলা হয়েছে, উন্নয়ন ব্লকগুলি এসকল কাজ সুষ্টভাবে সম্পাদন করলে এবং উপজাতিদের রক্ষাপ্রদ আইনগুলি কার্যকরী হলে পঞ্চম তপশীলের লক্ষ্য কিছুটা বাস্তবায়িত হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে পঞ্চম তপশীলে উল্লেখিত অধিকার উপজাতিদের কতটুকু উন্নতিবিধান করতে পারে? এটা অনস্বীকার্য যে ভারতের তথা ত্রিপুরার উপজাতিরা শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ এবং সুদখোর মহাজনদের দ্বারা সব-চাইতে বেশী শোষিত। এই উপজাতিদের রক্ষা করা এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করাই হচ্ছে পঞ্চম তপশীলের লক্ষ্য।

পূর্বে ত্রিপুরার উপজাতিরা প্রধানতঃ জুমচাষ দ্বারাই তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। জুমচাষ করার জন্য তাদের ভূমিরও কোন অভাব ছিল না। কিন্তু পার্শ্ববর্তী বাংলা, মনিপুর, আসাম প্রভৃতি রাজ্যের সাথে ত্রিপুরার সংস্রব বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে লাগল। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে রত্নমাণিক্যের রাজত্বকাল থেকে বাঙ্গালীরা ত্রিপুরায় এসে বসতি বিস্তার করতে থাকে; পরবর্তীকালে পূর্ব-পাকিস্থান অধুনা বাংলাদেশ হতে দলে দলে উদ্বাস্তুরা এসে ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। আবার ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মুরশিদাবাদের নবাবের ত্রিপুরা আক্রমণের ফলে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলীম সম্প্রদায়-ভুক্ত লোক ত্রিপুরায় প্রবেশ লাভ করে এবং ত্রিপুরাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। অধিকন্তু

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মনিপুরে বার্মার আক্রমণের [প্রথম] ফলে বেশ কিছু সংখ্যক মনিপুরী সম্প্রাদায়ভুক্ত লোক মনিপুর পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে ইহারা ত্রিপুরা, কাছাড় এবং শ্রীহট্টে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে উপজাতিরা সবচাইতে পশ্চাৎপদ। তাদের এই নিরক্ষরতা আর সরলতার সুযোগ নিয়ে সুদ-কারবারী মহাজনেরা অবাধে শোষণ কার্য চালিয়েছে। উপজাতিদের যে নিজস্ব সংস্কৃতি তা-ও উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবে লুপ্ত হতে বসেছে। যদিও সরকার থেকে এসব ব্যাপারে কিছুটা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। ডাবর কমিশন অলটারনেটিভ প্রোগ্রাম-এর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সেই অনুসারে ত্রিপুরায় বেশ কয়েকটি উপজাতি উন্নয়ন ব্লকও স্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু এই ব্লকগুলি উপজাতি সমস্যা সমাধানে স্পষ্টতঃই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এখনো প্রায় ২০ হাজার জুমিয়া পরিবারের না আছে জমি, না আছে বাড়ী, না আছে কোন জীবিকা। সুতরাং এই অলটারনেটিভ প্রোগ্রাম দ্বারা উপজাতি সমস্যার সার্বিক সমাধান সম্ভব নয়। যদি এই ক্ষয়িষ্ণু উপজাতি সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে হয় এবং তাদের জীবনধারণের মান উন্নীত করতে হয়, তাহলে পঞ্চম তপশীলের বিধানগুলি ত্রিপুরায় কার্যকরী করা দরকার যদি উপজাতিদের জমি ও বনে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়, যদি মহাজনদের শোষণ হতে তাদের রক্ষা করতে হয়, উচ্ছেদের হাত হতে বনকরদের জুলুমের হাত হতে যদি তাদের রক্ষা করতে হয়, তা হলে শক্তিশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন "Tribal advisory council with supervisory function" উপজাতিদের সমস্যা সমাধানের পথে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাকে ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকা

হিসাবে পুনর্গঠিত করে অটোনমাস ট্রাইবেল ডিস্ট্রিক্ট গঠন করা যেতে পারে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এই জেলা কমিটির হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ ও ক্ষমতা দান করা দরকার। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে বর্তমান উন্নত ও বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি পদ্ধতির যুগে জুমচাষ প্রথা খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। সুতরাং জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বাড়তি জমি ও খাস জমি বিনা নজরে ও বিনামূল্যে বণ্টন করে দেওয়া যেতে পারে এবং আবাদযোগ্য জমি রিজার্ভমুক্ত করে জুমিয়া ভূমিহীন গরীব কৃষকদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়া যেতে পারে এবং জুমিয়াদের আধুনিক উন্নত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিপদ্ধতি সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার, যাতে তারা ধীরে ধীরে আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। এটা আশাব্যঞ্জক যে এ যাবৎ বেশ কিছু উপজাতি কৃষক পরিবার আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য নির্বাহ করছে। অধুনা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন আছেন। আশা করা যায় এই জনপ্রিয় সরকার উপজাতি সমস্যার আশু সমাধানে সচেষ্ট হবেন, কেননা তাঁদের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে এই বিষয়ে তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।



: তথ্যপঞ্জী :

১। শ্রীরাজমালা

—কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

২। রাজমালা

—কৈলাশ সিংহ।

৩। রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

—দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ও সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট, দ্বাদশ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ)

৫। ত্রিপুরাদেশের কথা

—ত্রিপুর চন্দ্র সেন।

৬। বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড,

—রমেশ চন্দ্র মজুমদার।

৭। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম

—সুপ্রকাশ রায়।

৮। সমশের গাজীর জীবন চরিত

—শেখ মনোহর আলি।

৯। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

- ডঃ তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত।

১০। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস

- ডঃ বিজিত কুমার দত্ত।

১১। ত্রিপুরার আবৃত ইতিহাস (ইংরেজ পর্ব্ব)

- কে, পি, দত্ত।

১২। ত্রিপুরার ইতিহাসের রূপরেখা

(গোমতী, আগষ্ট, ১৯৭৭ ইং)

- ডঃ জগদীশ গণচৌধুরী।

১৩। সমশের গাজী একটি স্মরণীয় নাম
(স্বাগতম, ২য় সংখ্যা, ১৯৬৯ ইং)
—রমাপ্রসাদ দত্ত।

১৪। রাজন্য ত্রিপুরার সাম্প্রদায়িক কর— কাজিয়ানা,
(গোমতী, ডিসেম্বর, ১৯৭৫ ইং)
—জ্যোতিশ চন্দ্র দত্ত।

১৫। Calcutta Review, Vol. XXXV

১৬। Tripura Buranji (in Assamese)
—Ratnakandali and Arjundas

১৭। Statistical Account of Bengal Vol VI,
—W. W. A. Hunter.

১৮। Stewart's History of Bengal.

১৯। Noakhali District Gazetteer.

২০। Economic problems of the Jumias of Tripura, Cal 1969 - J. B. Ganguli.

২১। Kukis of Tripura.
—Ram Gopal Singh.

